নামাচার্য্য শ্রীরামদাস

সুশীল কুমার সেন

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখী পূর্ণিমা ফুলদোল,
৩০শে বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীভীমচরণ সেন
১৬৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড,
কলিকাতা-৩৬।

প্রচ্ছদপট : শ্রীশ্যামল সেন

ব্লক : টাওয়ার হাফটোন (১৯৫৪) কোং
৫৪ ক্রীক রো
কলিকাতা-১৪।

মুদ্রণ : শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিঃ
৮।১, লালবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১।

প্রচ্ছদপট ও
চিত্র মুদ্রণ : ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১এ টাগোর কাসল্ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

পূজনীয় পিতৃদেব ও স্নেহময়ী জননীকে

উৎসর্গ করে ধন্য হ'লাম

—সুশীল

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে' এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমাদের জানা, বাহির হইতে অনেকটা শোনা কথা, অনুমানমাত্র। তাহা অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞান নয় এবং বিজ্ঞান ত নহেই, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাগ্যবানকে কিরূপে কেমন ভাবে কৃপা করেন বস্তুগত্যা সে সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় ঘটে না। শ্রীমান সুশীলের 'নামাচার্য্য শ্রীরামদাস' পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে বস্তুগত্যা ভগবৎ কৃপার এই জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক ধারাটী উপলব্ধি করিলাম।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের কৃপা আমাদের সকলের উপরই রহিয়াছে। তাঁহার কৃপা জলে স্থলে অনলে অনিলে, এক কথায় চরাচরে পরিব্যাপ্ত আছে। তথাপি গুপ্ত। তিনি সুরে সুরে আমাদের জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি আমাদের এত কাছে থাকিয়াও সবচেয়ে আমাদের দূরে, তাঁহার স্বর আমরা ধরিতে পারি না, তাঁহার আদর আমাদের স্পর্শ করে না, তাঁহার কৃপার পারাবারে ডুবিয়া থাকিয়াও বিবিধ তৃষ্ণায় আমরা প্রতিনিয়ত আকুল এবং ব্যাকুল। চারিদিকের গোলে পড়িয়া আমাদের মনে সব সময় একটা উতরোলের ভাব।

আমাদের পিপাসা দুরন্ত, নিতান্ত এবং একান্ত। তৃষ্ণার তাড়নায় প্রতিনিয়ত আমরা বড় বিভ্রান্ত, পিপাসায় বারিবিন্দু আমাদের জোটে না, এইরূপ অবস্থায় ভগবান কৃপাময়, তিনি প্রেমময়, এসব কথা শুনিয়া আমাদের বুক ভরে কি? প্রাণ শীতল হয় কি? শ্রীভগবানের প্রেম দৃঢ়ভিত্তি ধরিয়া আমাদের অন্তরে পরিস্ফূর্ত্ত হয় না—প্রেমের সঙ্গে দেখাদেখি আমরা পাই না বলিয়া ভগবানের প্রেমের কথা, আমাদের জন্য তাঁহার ব্যথা আমাদের কাছে ফাঁকি হইয়া দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রেম নির্ব্বিশেষ হইলেও বিশেষরূপে আমাদের অন্তরে বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। সে প্রেমকে দেখিতে হয়, চাখিতে হয় এবং সমগ্র অন্তর দিয়া আস্বাদন করিতে হয়। এইরূপ নিজ সম্বন্ধ মননের পথে স্থায়ীভাবে ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। প্রত্যুত প্রেম এজ্-মালি বস্তু, এমন ধারণায় তাহা আমাদের অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করে না, তাহা তাজা হয় না। আমাদের মন শুধু সেই ধারণায় মজে না। সে প্রেম আমার সম্বন্ধে কেবল, এমন একান্ত অনুভূতিতে গূঢ়। গভীর প্রীতির রীতিতে এ প্রেমের কমল আমাদের মনের মূলে আত্মভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া আমাদের কাণে কাণে কথা বলেন, আমাদের প্রাণে প্রাণে তাঁহার গীতি বাজে। তিনি দূর হইতে আমাদের অতি দূরে। তাঁহার মৃদুমধুর সুরটী শুনিয়া আমরা তাঁহার দিকে তাকাই এবং আমাদের জন্য তাঁহার আকুলতা ও ব্যাকুলতার ভাবটী প্রত্যক্ষ করিয়া পরম চিন্ময়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ি। চিন্ময়ের উপর ভগবৎ কৃপা পরম চিন্ময়ে আমাদের জড় বিচার লয় করে। আমাদিগকে জয় করিয়া লয়।

প্রকৃতপক্ষে নিত্যধাম বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননে যে বাঁশী বাজিতেছে তাহার সুর আমাদের জড় মনের স্তরে ধরা পড়ে না। গুরুর স্বরের ভিতর দিয়া সেই সুর আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায় এবং আদরে আদরে আমাদের বুক ভরিয়া দেয়, সুরের ছন্দে মধুর দেবতার আদরে এই যে উন্মেষ ইহা চিন্ময় বস্তু। ইহার সংস্পর্শে জড় প্রতীতির বিলুপ্তি ঘটে। এ আদর নড়ে চড়ে। শুধু তাই নয় আমাদিগকে নাড়ায়। প্রাণময় মনোময় তার বিকাশ। ভাবকে আশ্রয় করিয়া অনুভাবে তাহার বিলাস। এই অনুভাব ভাস্বর। দূরত্বকে লয় করিয়া প্রজ্ঞানময় ইহার উদয়।

ভাব অনেকটা অন্তরের উপলব্ধির ব্যাপার, তাহার মূলে সাময়িকতার

সংস্কারও থাকিতে পারে। জীবনের গোড়া ধরিয়া তাহা সব সময় নাড়া দেয় না। অর্থাৎ আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন তাহাতে ঘটে না, ইহা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন সকল জুড়িয়া অনুভাবের প্রভাব। ইহার সাড়ায় আমাদের জীবন দিব্যধারায় গড়িয়া উঠিবার সম্বলটী মনের মূলে পায়। বস্তুতঃ অনুভাবে প্রত্যক্ষতার পরমবল নিহিত থাকে, ইহা প্রভবিষ্ণু। আমরা খোলা চোখেতেই অনুভাবের আশ্লেষণ ও আবেষ্টনে শ্রীভগবানের প্রেমের লীলা ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করি, যিনি অধর তিনিই আমাদের কাছে ধরা পড়িয়া যান। যিনি চরাচর জড় চেতন সকল জুড়িয়া তাঁহার আদর আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। অনুভাবের এমন উদার প্রভাব, অলক্ষ্য তাহার এমন মাধুর্য্য ও বীর্য্য, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। অঙ্গ দিয়া শ্রীভগবানের অনঙ্গ রঙ্গের এমন উদ্দীপন আমাদের মনের কোন্ গহনে চুম্বনের উপর চুম্বনে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আপ্যায়িত করে। সর্ব্বাত্ম স্বপন এমন লীলার আকর্ষণে আমাদিগকে পড়িয়া যাইতেই হয়।

ঠাকুর নরোত্তম ভগবৎ কৃপার এই চাতুরী এবং মাধুরী বিস্তার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, সুধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন, অর্চ্চন স্মরণ ধ্যান, নববিধ মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ।' প্রকৃতপক্ষে ভক্তের অঙ্গকে উদ্দীপিত করিয়াই শ্রীভগবানের অনুভাব আমাদের এই স্তরে প্রভাব বিস্তারের সঞ্চার সামর্থ্যে জাগে। শ্রীভগবান স্বয়ং ভাগবতে উদ্ধবকেও এই কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভগবদুক্তি এই যে, ভক্তের সঙ্গ করিতে করিতে মন মুক্তসঙ্গ হয় তখন নির্ম্মলচিত্তে শ্রীভগবানের তত্ত্ব বিজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই স্ফুরণের পথেই আত্মধর্ম্মের উদ্দীপন এবং আমাদের জড়স্তর হইতে নিত্যলীলার সংস্পর্শে আমাদের উজ্জীবন লাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বিষয়াসক্ত আমাদের মন, কৃষ্ণভক্তের

সঙ্গলাভে আমাদের রতিমতি হইবে কেন ? তাঁহাদের অঙ্গ দেখিবার জন্ত আমাদের আগ্রহ জন্মিবে কামাসক্ত চিত্তে, প্রেমের এমন প্রভাব এত দূরের কথা। মনকে বিষয়ের খুঁটিতে বাঁধিয়া লইয়া আমরা ভক্তের সঙ্গ করিতে যাই। অঙ্গ দেখিবার মত নজর আমাদের কোথায়। ফলতঃ আমাদের মনের অলি গলিতে স্ত্রীপুত্র পরিবার ইহাদের মুখই উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কেমন করিয়া ভক্তের অঙ্গ দেখি ? কোন অছিলায় নিজের কাজটী বাগাইয়া লইয়া ভক্তের নিকট হইতে ভঙ্গ দিতে পারিলেই আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। এই ত আমাদের মনের অবস্থা।

কিন্তু আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমাদের চাহিতেছেন, আমরা না খুঁজিলেও প্রেমের ঠাকুর আমাদিগকে খুঁজিতেছেন, আমরা তাঁহাকে না ভজিলেও তিনি আমাদিগকে ভজনা করিতেছেন। শ্রীভগবানের এমনই স্বভাব। তাঁহার স্বভাবের জন্যই তিনি প্রেমময়। নতুবা তিনি যদি নিজের ঘাঁটিতে বসিয়া রাজা গজা হইয়া থাকেন, আর সংসার চক্রে আমাদিগকে ফেলিয়া দূরে থাকিয়া নিজে মজা উপভোগ করেন তবে তাঁহাকে 'প্রেমময়' 'দয়াময়' এসব আখ্যা দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকে না। সেক্ষেত্রে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে নিতান্ত জড় এবং নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের সম্পর্কে এমন ধারণা যুগে যুগে বহু মতবাদের বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছে, অবিতর্কিত লিঙ্গে তাঁহার সঙ্গ এবং পরম প্রসাদ হইতে জগত বঞ্চিত রহিয়াছে। বিশ্বের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। কলির জীবের কিন্তু সে দুঃখ নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীভগবানের প্রেমের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। তিনি রসময় আনন্দময় প্রেমময় এই সত্যটী বিশ্ববাসীর ছবিতে প্রমূর্ত্ত হইয়াছে। এ লীলায় জীবের সহিত ভগবানের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে।

নিতাইচাঁদ জীবের দ্বারে পড়িয়া নাম বিলাইয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন, বৃন্দাবনের বাঁশী নামের ধারায় জড়াইয়া মিশিয়া আমাদের কাণে আসিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। ভক্ত মুখে উচ্চারিত নামে শ্রীভগবানের কোলের দোল আমাদের অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে। প্রেমস্বরূপিনী রাধারাণী ও তাঁর সখী ও মঞ্জরীগণ নামের প্রসঙ্গে নামিয়া আসিয়া আমাদের মনের মূলে অনঙ্গলীলার তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। ভগবানের আদরের সুরে সুরে আমাদের জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। নামপ্রেমে উচ্ছ্বসিত অনঙ্গ-মঞ্জরীর সেই রঙ্গ, ভক্তের অঙ্গে বিভঙ্গি তুলিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। হরিনাম উচ্চারণ, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে হরিপুরুষের উদয় —বাবাজীমহারাজের কীর্ত্তনলীলায় এ খেলাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোপী-জনের গোপ্য অনুভব সকল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অনুভাবে উদ্দীপিত হইয়া আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। আমরা নিতাই গৌরের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পাইয়াছি।

শ্রীমান সুশীল সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনানন্দ লীলার যে অনুধ্যানে সে আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিয়াছে তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার ভাষায় ভাবে রসে আমাদের মনে শ্রীভগবানের তাজা প্রেমের জীবন্ত স্পর্শ অনুভব করি। মধুরিম সঙ্গিত—তাঁহার অনুধ্যানে প্রেমের মাধুরী সত্যই আমাদের অন্তরে সিঁধাইয়া যায়। আর সুরে সুরে আদরে আদরে বরবপু স্পন্দিত—প্রেম-ময় দেবতার চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ আমাদের অন্তরে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। ভুজ যুগ টঙ্কিত—প্রেমের দেবতা দুই বাহু বাড়াইয়া আমাদিগকে কোলে লইবার জন্য আগাইয়া আসিতেছেন এই অনুভূতি আমার এ অন্তরে উজ্জ্বল হয়। তারপর তনু পরিরম্ভিত—একবারে পরিরম্ভন বা আলিঙ্গন। আমাদিগকে কোলেবুকে জড়াইয়া ধরা, হরি বোল হরি বোল এই রোল। সব গোল কাটিয়া যায়। নামচিন্তামণি-কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহ। অনুগ্রহের

পথে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেমময় দেবতার সর্ব্বতোভাবে সেবার অধিকার লাভ করি। তখন অন্তর হইতে তাঁহার কৃপার জয়গান উঠে।

শ্রীমান সুশীল আমার একান্ত স্নেহভাজন। সুতরাং আমি তার প্রশংসা করিব না, করা উচিত নয়—কারণ, সে প্রশংসা আত্মপ্রশংসারই সামিল হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীগুরুস্বরূপে নিতাইচাঁদ তাকে কৃপা করিয়াছেন, এ কৃপা তাহার জীবনে সার্থক হইয়া উঠুক ইহাই আমার অন্তরের কামনা এবং বাসনা। সকলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে ইহাই আমার প্রার্থনা।

কৃপাপ্রার্থী—

বঙ্কিম চন্দ্র সেন

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্মজীবনে শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর প্রভাব অপরিমেয়। নাম, ভক্তি ও ভাবরসের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি জনমানসে, প্রেমের বীর্য্যে মানুষকে করে তুলেছিলেন উদ্দীপিত। ভক্তসমাজ তাঁকে বসিয়েছিল হৃদয়-সিংহাসনে। আর এই সিংহাসনে থেকেই বাবাজী মহারাজ আমার মত দীনাতিদীন, অযোগ্য ব্যক্তিদের ওপর স্নেহদৃষ্টিপাত করতে ভুলেন নি। এই হচ্ছে নামাচার্য্য শ্রীরামদাসজীর পরম বৈশিষ্ট্য।

চরণ-সান্নিধ্যে বস্‌বার অধিকার তিনিই দিয়েছিলেন। তাই সান্নিধ্যের সে মোহন-স্মৃতি কথা আজ এখানে বিবৃত করতে সক্ষম হচ্ছি। যিনি অপার করুণায় কাছে টেনে নিয়েছিলেন, আজকের এসব কথা বলাচ্ছেন তিনিই। ভাব ও ভাষা তাঁরই দেওয়া। অযোগ্য অধম আমি। দৈন্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি যা এ বই-এ ঘটেছে, তা ঘটেছে আমারই অপটুতার জন্যে।

তবুও এ দুঃসাধ্য কাজে নেমেছি—কারণ, যে আনন্দের রসধারা এ মহাজীবনের আশে পাশে উপ্‌ছে পড়তো, তারই স্মৃতিকণা কিছু এখানে প্রকাশ করছি ভক্তজনের কাছে প্রসাদ বিতরণের মত। কথা তাঁর, বিতরণের কৃপাও তাঁর ছাড়া আর কার হবে?

ইতিপূর্ব্বে 'রামদাস প্রশস্তি'-গ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রকাশনের ভেতর দিয়ে বাবাজী মহারাজের বিশিষ্ট ভক্ত ও অনুরাগীদের আশীর্ব্বাদভাজন হতে পেরেছিলাম। তদানীন্তন দেশ-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অপার স্নেহ লাভ করে সে সময়ে ধন্য হই। তাঁর প্রেরণা ও ভাগবত-কথার অপূর্ব্ব বর্ণনা ক্রমে ক্রমে আমাকে রামদাসজী সম্বন্ধে লিখতে উৎসাহিত করে।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এর পর বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে লিখেছি। এগুলোকে একত্রিত করে কোন গ্রন্থ রচনা করার কথা, বাবাজী মহারাজের জীবনালেখ্য রচনায় অগ্রসর হবার কথা তখন ভাবিনি। 'হিমাদ্রির' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে এ বিষয়ে প্রেরণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর শত কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যেও এ বই সম্বন্ধে নানা উপদেশ ও সাহায্য তিনি দিয়েছেন, এজন্য তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

তারপর এসে পড়ে, পরমধর্ম্মপ্রাণা স্বনামধন্যা লেখিকা শ্রীযুক্তা সরলা বালা সরকারের কাছে আমার ঋণের কথা। তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণী না পেলে একাজে অগ্রসর হবার সাহস আমি পেতাম না।

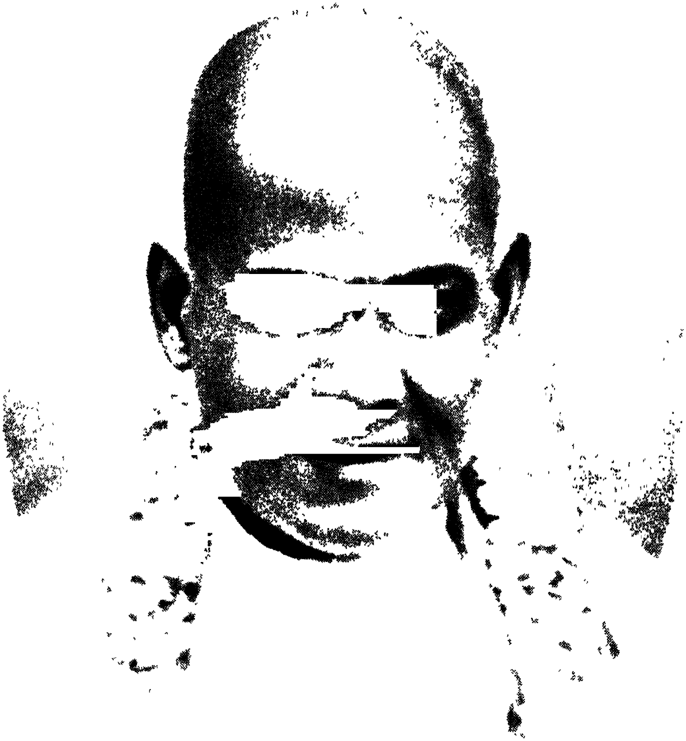
বাবাজী মহারাজের জীবনীকার, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের দিগ্‌নির্দ্দেশ ও আনুকূল্যের কথাও কোনদিন বিস্মৃত হবার নয়।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের মনোরম ছবির ব্লকটি 'টাওয়ার ব্লক (১৯৫৪) কোং' বিনামূল্যে তৈরী করে দিয়েছেন। এজন্য শ্রীচিররঞ্জন দাস মহাশয় আমার ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদপট ও বাবাজী মহারাজের ছবি ছাপিয়েছেন ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ এবং তাঁরাও এজন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতে রাজী হননি। এদের আনুকূল্যের জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

এবার উল্লেখ করছি স্বধামপ্রবিষ্ট হরিদাস ঘোষাল মহাশয়ের কথা। এঁরই চেষ্টা ও যত্নে পাঠবাড়ী গ্রন্থমন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এঁর লিখিত তথ্যাদি থেকে পাঠবাড়ীর ইতিহাসের নানা উপকরণ পেয়েছি।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যাঁরাই আমার এ ভক্তি-অর্ঘ্যকে পূর্ণতর করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আজ সীমা নেই। ইতি।

—গ্রন্থকার



নামাচার্য্য প্রসঙ্গে

মধুময় পুরোণো স্মৃতি, পূত সান্নিধ্যের আকুতি আজও মনের কোণে ভীড় করে দাঁড়ায়। হয়ত অনেক আগেই বিস্মৃতির অতল তলে এগুলো তলিয়ে যেত, যদি না সেই স্মৃতির পিছনে থাকতো হৃদয় পূর্ণ-করা অনুভূতি আর সেই মহাপুরুষের মহিমময় স্পর্শ। হয়ত সেই স্মৃতিকে ভাব ও ভাষার ব্যঞ্জনায় ষোল আনা ফুটিয়ে তুলতে পারব না। কারণ, সেদিকে অযোগ্যতা পদে পদেই রয়ে গেছে। তবু সেই স্মৃতির মধুরসকে সকলের কাছে পরিবেশনের লোভ সামলাতে পারলাম না।

যাঁর স্মৃতি নিয়ে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করছি, তিনি হচ্ছেন বাংলার মহাবৈষ্ণব সাধক, নামাচার্য্য শ্রীরামদাস। বাল্যের সহজ সরল চাপল্যের মাঝে তাঁর সংস্পর্শে কিভাবে এসে পড়েছিলাম সেই কথাই এখানে বলব। আমার বয়স যখন ১৩।১৪ বৎসর তখন কোন এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে শুনতে যাই শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্তন পোস্তা রাজবাটীতে। ছোটবেলায় আমি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিলাম, যাকে বলে ডানপিটে। কোন কিছুকেই বড় একটা ভয় করতাম না। রাজবাড়ীতে প্রবেশের পর ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য আমাকে চঞ্চল করে তুলল, ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে দেখতে অন্দরমহলে প্রবেশ করলাম। এসে পৌছলাম ঠাকুর দালানের বিস্তৃত চত্বরে। লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান

নেই। কোনরকমে জায়গা করে নিলাম বেশ ভিতরের দিকেই। আমার বয়স্ক সঙ্গীটিও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন না।

লোকের ভীড় জমে গিয়েছে! কিন্তু কোথায় বাবাজী মহারাজ, কোথায় বা তাঁর কীর্ত্তন গান। পাশের লোকের কাছে জানলাম, তিনি এইবার আসবেন। আশা-আকাজ্ক্ষা ও উদগ্র আগ্রহ নিয়ে এত লোক বসে থাকতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, একথা চিন্তা করতেই আমার কিশোর মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। আরও ভাবলাম, হবে ত কীর্ত্তন গান—তার জন্য এত ভীড়! এ গাইয়েই বা কি রকম? এটা ত অবশ্যই পরখ করে দেখতে হবে। নিরিখ করবার ক্ষমতা থাক বা না থাক, পরখ করবার উৎসাহ কিশোর মনে সেদিন কম ছিল না। অস্থির স্বভাবচঞ্চল বালক আমি একনাগাড়ে এতক্ষণ কখনও এক জায়গায় বসে থাকিনি। তবু বসে থাকতে হল। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে, সব কিছু চঞ্চলতাকে সাময়িকভাবে বিদায় দিতে হল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে শুনতে পেলাম সকলের মুখে,— ঐ আসছেন! ঐ আসছেন!

সকলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন এক সদ্যাগত পরম বৈষ্ণবকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আমিও সবার দেখাদেখি উন্মুখ না হয়ে পারিনি। সমবেত কণ্ঠে মৃদুগুঞ্জন—পথ ছাড়! পথ ছাড়! এ দিক দিয়ে যাবেন।

বিস্তীর্ণ চত্বরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন উন্নত উজ্জ্বলদেহ বাবাজী মহারাজ। মস্তক মুণ্ডিত। কি মধুর সর্ব্বচিত্তরঞ্জন মূর্ত্তি

ধীর স্থির প্রশান্ত সাত্ত্বিক বপু। কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সোজা এসে পৌঁছলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে। আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে সমগ্র জনতার উদ্দেশ্যে ভূমি স্পর্শ করে আনত মস্তকে প্রণতি জানালেন। যাঁর নামগান গাইবার জন্য বসেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে আনত মস্তকে বহুক্ষণ প্রণাম-বন্দনা করলেন অস্ফুট গদ্ গদ্ কণ্ঠে। চক্ষু মুদ্রিত। করতালে করদুটি স্পর্শ করা মাত্র যেন এক দিব্য ভাব তাঁর সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে আছি। বাইরের অনুভূতিকে ছাপিয়ে কিশোর মনে নেমেছে আনন্দের ঘোর। খোল-করতালের বাদ্য এত মধুর এত হৃদয়স্পর্শী তা জানলাম সেইক্ষণে এবং সেই প্রথম। এর পূর্ব্বে বহুবার কীর্ত্তন শুনেছি, শ্রদ্ধা ত আসেনি বরং অবজ্ঞাই দানা বেঁধে উঠেছে। এই কীর্ত্তনগান আরম্ভ করবার পূর্ব্বে চলতে থাকলো খোল-করতালের সঙ্গৎ। তারপর বাবাজী মহারাজ ধীরকণ্ঠে আরম্ভ করলেন কীর্ত্তন—

'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম॥'

এই দু' লাইন নামগানে বোধ হয় প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেলো। আশ্চর্য্য যে. এতে একঘেয়েমি আসেনি, বরং তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেন অমৃতের লহরী তুলতে থাকল। শ্রবণমন প্রাণ যেন 'আরো শুনি-আরো শুনির' চাহিদায় ভরপুর। আশ্চর্য্য! সহজ সুর, বাদ্যের মধ্যে শুধু খোল ও করতাল এত মধুসঞ্চার করতে পারে, নীরস হৃদয়ে তা জানা ছিল না। মনের মধ্যে চলতে থাকল নানা আলোড়ন। এ বৈষ্ণব কত বড় ঐন্দ্রজালিক! মাত্র এই দু' লাইন কীর্ত্তন গানে হাজার হাজার জনতার চিত্তকে

জয় করে বসেছেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত আচ্ছন্ন। বাবাজী মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে আছি নিষ্পলকভাবে। তাঁর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ নামগানের প্রতিবর্ণের উচ্চারণভঙ্গীটিও যেন কত মধুর। উচ্চারিত প্রতি বর্ণে রয়েছে পূর্ণামৃত ঢালা।

আজ বুঝ্‌ছি কীর্ত্তনীয়ার জীবনের সমগ্র সত্তা যদি সেই পরমপুরুষে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গিত হয়, তবেই কীর্ত্তনে এমন মাধুর্য্য পরিবেশিত হতে পারে।

বাল্যের স্মৃতিপটের এই ছাপটাই আমার পরবর্ত্তী জীবনে বাবাজী মহারাজের চরণপ্রান্তে বসবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছিল এবং সেই সূত্রেই সুযোগও ক্রমে না জুটে পারেনি।

নামগানের পর অরম্ভ হ'ল শ্রীশ্রীনামমহিমা কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের ভাষা আজ আমার সম্পূর্ণ মনে নাই, তবে স্বল্পবুদ্ধিতেও বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করেছিলাম কীর্ত্তনীয়ার দিব্য ভাবাবেশ দর্শনে, আর তাঁর অকৃপণ দান-মহিমায়। সে কীর্ত্তনের বিশেষ বিশেষ জায়গার কিছু কিছু মনে আছে। সেটুকু লিখছি, যদি ভুল থেকে যায় পাঠকগণ ক্ষমা করবেন—

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
(ওরে ভাইরে) এইত কলিযুগের মহামন্ত্র—
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম
পরিত্রাণের মূলমন্ত্র,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

কলিযুগোচিত এই নামধর্ম্ম
এ যে বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম।
"চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র আঠারো পুরাণ তন্ত্র
গীতা আদি করিয়া মন্থন"
এই হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
এই নাম অখিল রসের ধাম।
অভেদ নাম নামী,
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ।
চৈতন্য রসবিগ্রহ—
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দ-নন্দন পেতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
অনাদির আদি গোবিন্দ পেতে—
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
সচ্চিদানন্দ ঘন মূরতি দেখতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ক'রতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে।
কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'রতে
এই নাম বই আর সাধন নাইরে। (ইত্যাদি)

নাম মহিমার এই উচ্ছ্বল তরঙ্গ ধাপে ধাপে মধুরাতিমধুর পরিবেশনে শ্রোতাদের দেহ মন প্রাণের জাগতিক সত্তাকে যেন লয় করে দিতে চাচ্ছিল। প্রকৃত কথা বলতে কি, বাবাজী মহারাজের ঠিক ঠিক পরিচয় পেতে হলে তাঁর উৎসর্গিত মহাজীবনের দানলীলার দিকেই নজর দিতে হবে বেশী। সে দানলীলাই হচ্ছে কীর্ত্তন। কীর্ত্তনে তিনি এক নবযুগ সৃষ্টি করে গেছেন। সাধারণভাবে এখানে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে, কীর্ত্তন বলতে আমরা মোটামুটি কি বুঝি! এ হচ্ছে ঠাকুর-দেবতার রূপ, রস ও গুণসূচক গান। এর ভাষা এবং সুরেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই কীর্ত্তনকে আবার প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—লীলাকীর্ত্তন ও নামকীর্ত্তন। লীলাকীর্ত্তন পালাক্রমে যেমন, দান মাথুর ইত্যাদি বহুতর ভাবে গাওয়া হয়ে থাকে এবং এতে মধুর রসের পরিবেশনই অধিক। আর নামকীর্ত্তন বলতে—ভগবৎনামের মহিমাসূচক কীর্ত্তন।

রামদাসজী নামকীর্ত্তনে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন প্রেম ও সুরের ঝঙ্কারে। সন্ধ্যায় সকালে দৈনন্দিন জীবনে যাঁরা নাম গান করে, সেও কীর্ত্তন, কিন্তু সে কীর্ত্তনে ক'জন মানুষের জীবনের মোড় ফিরে যায়? বাবাজীরও সেই কীর্ত্তন এবং সে-ই ভাষা। অথচ দুই-এতে কত তফাৎ! কীর্ত্তনের ভাষার সঙ্গে যাদের জীবনের রং ফলেনি, তাদের কীর্ত্তনে সুর তান লয়ের কারুকার্য্য কতকটা থাকতে পারে বটে, কিন্তু সমাজের বা জাতির তেমন কোন উপকারে আসে না।

এই নামকীর্ত্তনে বাবাজী মহারাজ নিজের সাধনাকে প্রতিবিম্বিত করেছিলেন ভাব ও সুরের মাধুর্য্যে, আখরের সরসতায়। যে কোন মহাপুরুষ আমাদের যা-কিছু উপদেশ দান করেছেন, তা বেদ-বেদান্ত পুরাণ ছাড়া নয়, সবই অনেক আগে বলা হয়ে আছে। তবে আমাদের গ্রহণের উপযোগী করে, নূতন নূতন করে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা সে সব জানিয়ে যাচ্ছেন।

কীর্ত্তনের সুর-সুরধুনীর তরঙ্গের তালে তালে ছন্দায়িত করে এমনই এক সহজ অনাবিল নামের আস্বাদনকে সহজতর করেছেন, তার মহিমাকে রূপদান করেছেন বাবাজী মহারাজ। তাঁর জীবনের পরম বিত্তকে অকৃপণ হয়ে বিলিয়েছেন জনসাধারণের মধ্যে হাটে-বাজারে। তাই না আবালবৃদ্ধ নরনারী তাঁর কণ্ঠের মধুঝঙ্কারে অননুভূত প্রেমের স্পর্শ পেয়েছিল, যার জন্য বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের কথা শুনলে কাতারে কাতারে তারা ছুটে আসতো। তাঁর কীর্ত্তনের এমন এক মাধুর্য্য ছিল যে, রসভোক্তা পেতরসের চরম আস্বাদন, তাপদগ্ধ লোক পেত পরম সান্ত্বনা। মোট কথা, "যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয় বাঞ্ছাকল্পতরু"—এই বাক্য যেন পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করত।

কীর্ত্তনের সময় তাঁর ভাববিহ্বল মূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া শ্রীসরলাবালা সরকার একবার বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের কীর্ত্তনকালীন একটি ছবিতে তাঁর স্তুতিবাচক এক শ্লোক আছে, যার ভাবার্থ এই—সংকীর্ত্তনে আনন্দজাত মৃদুমন্দ হাস্য, আবার সেই সঙ্গে স্বেদ ও অশ্রুতে স্নাত, পুলকাবলীতে শোভিত এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি যিনি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীল নরোত্তমকে

বার বার প্রণাম।—এই বর্ণনার সঙ্গে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনকালীন মূর্ত্তির বর্ণনা যেন একেবারে মিলে যায়।"

বাবাজী মহারাজের এ কীর্ত্তনমধুর মূর্ত্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল অতি অল্প বয়সেই—কি জানি কোন্ সুকৃতির বলে কিংবা মহাপুরুষের অযাচিত কৃপা প্রভাবে। কীর্ত্তনকালীন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আখরগুলি কীর্ত্তনের বিষয়বস্তুকে সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিত। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তার পরের কি আখর প্রকাশ পাবে, তার জন্য তনু মন প্রাণ এক করে উদ্গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করত। সে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ! সহজ সুমধুর সুর অথচ তার কি অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি, যার একই চরণ তাঁর মুখে বার বার শুনলেও মনে হ'ত যেন নিত্যনূতন। এই নামকীর্ত্তনের ফাঁকে ফাঁকে নিতাই-চৈতন্য ও রাধা-কৃষ্ণের লীলাগুণ এমনি নিপুণভাবে পরিবেশিত হত যে, শ্রোতৃবৃন্দ নামের মহিমাকে সহজে উপলব্ধি করতে পারত। সুরে সুরে ভাববল্লরী ছন্দায়িত হয়ে উঠতো, আর সেই প্রেমময়েরই বাণী ঝঙ্কৃত হ'ত অগণিত ভক্তজনের মর্ম্মস্থলে।

বাবাজী মহারাজ গৌরপরিকরগণের ও আচার্য্যগণের লীলানুধ্যানের মরম কথাই ব্যক্ত করেছেন প্রেমের অনাবিল ছন্দে। শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যের পদাঙ্কিত ভূমিতে পূর্ব্বে যে সব লীলা হয়েছে সেখানে নানা সময়ে উপস্থিত হয়ে সেই লীলাস্মৃতিকে জনচিত্তে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতেন যেজন্য বৈষ্ণবজগত তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে যুগ যুগ ধরে।

এ মহাবৈষ্ণবের আর একটি বিশেষ দান 'সূচক' কীর্ত্তন। মহাপ্রভুর পার্ষদ ও তাঁর পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের তিরোধান তিথি উপলক্ষে গৌরচন্দ্রিকা কীর্ত্তন ও তৎসহ সামান্য কিছু কীর্ত্তন অনুষ্ঠানের হয়ত বা ব্যবস্থা ছিল, যার সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগই ছিল না। বাবাজী মহারাজ সেই সব তিরোধান তিথি ধরে তাঁদের জীবনলীলা ভাব ও সুরের ছন্দে পরিবেশন করতেন। এই কীর্ত্তন "সূচক কীর্ত্তন" নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছে। এর ব্যাপকভাবে প্রচার করেন বাবাজী মহারাজই। আবার এই সূচক কীর্ত্তন গীত হওয়ায় ক্রম, ভাব, ভাষা ও সুরের যে ছাঁচটী মানুষের মনের মূলে গিয়ে একটী রূপমাধুর্য্য লাভ ক'রেছে, তাও তাঁরই উদ্ভাবন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কীর্ত্তন চলতে থাকে যেন বিরামহীন সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। প্রেমগম্ভীর বাবাজী মহারাজের পরম আকুতিটি মনুষ্যহৃদয়রূপ তটভূমিতে আছড়ে পড়তে থাকে, সেই ঢেউয়ের সঙ্গে কত না মণি-মাণিক এসে হৃদিতটভূমিতে বিছিয়ে দিয়ে যায়। এ মহাতরঙ্গ অকৃপণ হয়ে কেবল দানই করে যাচ্ছে। যে জহুরী, সে অবশ্যই একদিন না একদিন রত্ন আহরণ করে নেবেই।

আমার হৃদয়ে তখনও এ রত্ন আহরণের ইচ্ছা জাগেনি। আমি তখন কেবল অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাববস্তুর সম্মুখে সম্মোহিত। তিন ঘণ্টা যাবৎ অপলক দৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে আছি। কি জানি কি এক দিব্য প্রেমের

বিচ্ছুরিত কিরণপ্রভায় আমার হৃদয়ক্ষেত্র আনন্দোচ্ছ্বল হয়ে উঠছিল।

কীর্ত্তনমূর্ত্তি বাবাজীমহারাজের কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যই আমাকে মুগ্ধ করেছিল যে, সাধনোত্থিত ভাবসম্পদটি সংক্ষেপে সরল ভাষায় কীর্ত্তনের সুর মাধুর্য্যে তিনি ফুটিয়ে তুলছিলেন গণচিত্তে। তিনি কীর্ত্তনে যে সব আখর দিতেন তা বহু ভক্তকে লিখে নিতে দেখেছি; পরে তা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে। শুনলাম, আজ সেই সব সংগ্রহগুলি ছাপাবার উদ্যোগ চলছে। অবশ্যই সে এক বিরাট গ্রন্থ হবে—তাতে সাহিত্য, কবিত্ব, রস, অলঙ্কার কোনটারই অভাব নেই। সুধী-সমাজ নিশ্চয় একদিন গবেষণা করবেন তাঁর এ দানের ব্যাপকতা নিয়ে। রসজগতের পরম নির্যাস এ মহাসাধক ভাষার ফাঁকে ফাঁকে রেখে গেছেন —যাঁরা ভাগ্যবান, ভক্তিধনের অধিকারী, তাঁরা তা ঠিক খুঁজে নেবেন।

তাঁর মধুর কীর্তনে এমন এক প্রাণময় আবেদন ছিল, যা সকল সঙ্কীর্ণতাকে ধুয়ে মুছে প্রেমের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলত, উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র কোন ভেদ থাকতে পারত না। মহাপুরুষের এমনই ভাব যে যখন যেখানে গেছেন, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতা সব ভেঙ্গেচুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক প্রেমের পরিবার।

বাবাজী মহারাজকে কখনও শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলা-কীর্ত্তন পালাক্রমে গাইতে শুনিনি; কিন্তু তিনি নামকীর্ত্তনের ফাঁকে ফাঁকে কখনও স্বরচিত আখরে কখনও বা পদ-পদাবলীর

উদ্ধৃতি করে এমন এক পরিবেশন-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করতেন যে, বিষয়-বস্তুটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে বসে যেত। তিনি কোন কীর্ত্তন-গান লিখতেন না। কীর্ত্তন আসরে বসে যা তাঁর স্ফূর্তি পেত তাই হচ্ছে তাঁর রচনা। এই রচনাসম্ভার আজও উদ্গীত হয় প্রেমভরে কত সহস্র ভক্তকণ্ঠে।

ভক্তসমাজে শ্রীল বাবাজী মহারাজের পরিচয় নূতন করে দেবার মত কিছুই নেই। তিনি বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই এই জগতে এসেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক ও বিদ্বানগণ তাঁর চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিককে উপলক্ষ করে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন বহু পত্র ও পত্রিকায়। সত্যিই দেশ বহুদিন এরকম একজন মহিমময় পুরুষকে পায়নি। বহুগুণে গুণী হয়েও নিজেকে নিতান্ত দীন হীনভাবে তিনি প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভকে কতদিন ঢেকে রাখা সম্ভব? সে যে ছড়িয়ে পড়বেই দিকে দিকে।

তাঁর সারা জীবনটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, যেটি আমাদের কাছে কঠোর তপশ্চর্য্যা, সেটি তাঁর কাছে অনায়াস-সাধ্য। যিনি তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছেন তিনিই লক্ষ্য করেছেন, এরূপ নিরলস ও অবিরাম ভজনে ব্যাপৃত মানুষ জগতে অতি দুর্ল্লভ। চলনে বলনে, আলাপে বিশ্রামে সদাই চলতো তাঁর ভজন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বীয় ভজনে ব্যাপৃত থেকেও আমাদের জন্য কি বিপুল দান রেখে গেছেন সেটাই এবার আলোচনা করছি।

ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্নদান—প্রত্যক্ষভাবে সত্যই এ দানের মহিমা অপার অনন্ত। কিন্তু এ দান স্থায়ী নয়, কারণ, গ্রহীতার পক্ষে সাময়িকভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু আবার তার ক্ষিদে পায়। আবার তাঁকে ছুট্‌তে হয় খাবার সংগ্রহের জন্য। এমন কোন্‌ দান আছে যাতে মানুষের আসল ক্ষুধা—পরম শান্তি ও প্রেমের ক্ষুধা মেটে! সেই দানই বাবাজী মহারাজ জীবন ভ'রে ক'রে গেছেন। সে দান হচ্ছে নামদান।

এ বস্তু এমনই ব্যাপক যে বিশ্বজনের কাউকেই বাদ দিয়ে তার বিস্তার নয়। বিশ্বের যেখানে রয়েছে মূল ক্ষুধা সেখানে এ দানের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে, এনে দেয় প্রেম ও পরা শান্তি!

বিশ্বের সর্ব্বত্র আজ স্বার্থের লেলিহান জিহ্বা উদ্যত হয়ে উঠেছে, সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে চাইছে। কিন্তু তার প্রকৃত অভাবটা কোথায়? এর উত্তর হ'চ্ছে—জগত প্রেমশূন্য কখনই নয়, তবে মাঝে মাঝে এ প্রেম এত তরল হ'য়ে যায় যে, তাকে দানা বাধাবার জন্য সেইরকম দানাদার প্রেমিকের প্রয়োজন হয়, আর সেই প্রেমিক সাধকের প্রেমের উৎস হ'চ্ছে প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান। এই শ্রীভগবানের নাম যিনি জীবের দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন তিনি কত কল্যাণকামী, কত উদার!

মানুষ যখন ভগবানকে ভোলে, তখনই স্বার্থের হানাহানিটা বেড়ে যায়, তাঁর দানটাকে সে অস্বীকার করে। প্রতি পদে পদে তাঁর দানকে স্বীকার করেই আমরা পেতে পারি তাঁর মহিমা ও স্বরূপের পরিচয়—এরই ভেতর দিয়ে হয় পরম প্রাপ্তি। এই দানই মহাপ্রেমিক সাধক, বাবাজী মহারাজ ক'রে গেছেন।

পিত্তবিকারগ্রস্ত মানুষের জিহ্বায় শুধু এই নাম স্বাদু মনে হবে না জেনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রস দানও করেছেন। তিনি ভগবানের নাম ক'রেছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরই দেওয়া দানকে নামামৃত রসে অভিসিঞ্চিত ক'রে তাদেরই মুখে তুলে দিয়েছেন। সে বস্তুর স্বাদ হ'য়েছে অমৃতময়। পরিবেশনও হ'য়েছে অপরূপ।

দেখা গেছে অপরূপের হাটে অপরূপেরই বিকিকিনি চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহস্র সহস্র লোককে অন্নদানও ক'রেছেন। চাঁদার খাতায় চাঁদা তুলে নয়, সভাসমিতি ক'রেও নয়। ক'রেছেন নামকীর্ত্তন করে আর আঁচলের খুঁট বাড়িয়ে দিয়ে। এটা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ ক'রেছি বহুক্ষেত্রে।

যেখানে প্রেম আছে সেখানে খুঁদ খুঁটে খেয়ে পাঁচজন বেঁচে থাকে, আর যেখানে সেটির অভাব—সেখানে একজন খেয়ে স্ফীতকায় হয়ে ওঠে, আর বাকি চারজন শুকিয়ে মরে। বাবাজী মহরাজ নামদান আর অন্নদান করে গেলেন। আবার এই দানের ভেতর দিয়ে মানুষের ভগবানকে পাওয়ার পথটাকে খুলে দিলেন অপরূপ এক কৌশলে।

নামদান যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, চণ্ডালে আর ম্লেচ্ছে কোন বিচার রাখলেন না তিনি—করে দিলেন একাকার। 'ব্রাহ্মণ চণ্ডালে করে সেখানে নানা রঙ্গ'। মহাপ্রভুর ধারাকে আবার তুলে ধ'রলেন একক অবদানে। এর জন্য কারও সঙ্গে তর্ক করলেন না, কোন সঙ্ঘ গড়লেন না। চুপিসারে কাজ সারলেন। অন্নদানের বেলাতেও সব ক'রে দিলেন ভাই ভাই—জাতের বালাই নাই কোন ঠাঁই।

বৈষম্য ও খণ্ডের ভাব কাটল, তবেতো আজ মানুষ বৈষ্ণবের উদারতার সঙ্গও স্পর্শ পেল। তাই আজ শিক্ষিতদের নজর প'ড়েছে বৈষ্ণবের কীর্ত্তন, মনন ও দর্শন নিয়ে আলোচনায়। এ দানের পরিমাপও যে আমরা ক'রতে পারি না। সংস্কৃতির বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্রের জীবনকে যে দান সমৃদ্ধ করে, ব্যক্তিগত বিচারে তা সব সময় পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠে না এবং আমরাও তার মূল্য ঠিকমত দিতে পারি না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ সাধনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন "সর্ব্ব বিদ্যা সঞ্জীবনী শক্তি এই নাম সংকীর্ত্তন।" এর প্রমাণ এ মহাবৈষ্ণবের সঙ্গীতময় জীবন। প্রেমভক্তি রসের এতবড় ভাণ্ডারী, সুরবিদ্, দর্শনের ক্ষেত্রে এতবড় দার্শনিক, বহুগুণে গুণী এই মহাপুরুষের জীবন একটি পরম পরিণতি স্বরূপে আমাদের চোখে ধরা দিল। বৈষ্ণব কবি ও সাধক শ্রীবৈষ্ণব দাস তাঁর শ্রীগুরুবন্দনা পদাবলীতে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাকে রূপায়িত ক'রেছেন। তিনি বলেছেন—তুমি আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হৃদয়কে করুণা কিরণে উদ্ভাসিত ক'রলে, তুমি আমায় যুগল ভজনের অধিকার দিলে, কিন্তু আমার প্রাণ তখনই ভরলো যখন—

"নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে পুরল সব মন আশ।"

কবি বৈষ্ণবদাস নামতরঙ্গে জীবের প্রার্থনাকে ভাবে রূপায়িত ক'রে নিজের অনবদ্য পদাবলীতে তা প্রকাশ ক'রলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেম-সম্পদটি অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে বিলিয়ে গেলেন তা-ই সেদিন এক অভিনব ব্যঞ্জনায় ধরা দিল বাবাজী

মহারাজের চরিত্রে। আমরা দেখলাম, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বাবাজী মহারাজের জীবনই মহাপ্রভুর বাণী।

বাবাজী মহারাজের ব্যষ্টি সাধনার মধ্য দিয়ে যে সমষ্টির আরাধনা—তা পূর্ণতা লাভ ক'রেছিল নামের মধ্য দিয়ে। বিশ্বভাবনায় ও বিশ্বচেতনায় তার উত্তরণ ঘটেছিল। বিশ্বভাবনার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখা—এটি চরম উপাসনা। শ্রীনিত্যানন্দের অনন্তশক্তির মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব।

ভারতের অধ্যাত্মচেতনায় নিত্যানন্দের যে বিশিষ্ট দান তাই ধরা দিয়েছিল বাবাজী মহারাজের সাধনায়। তাই না তিনি নিজেকে নিঃশেষ ক'রে জগত জীবের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন সেই প্রেমদাতার কারুণ্যঘন দানকে সুরে সুরে রূপায়িত ক'রে। তাই তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে নিত্যানন্দ মহিমা-কীর্ত্তন বেরিয়ে এসেছিল এক অপরূপ ঝঙ্কারে। ইতিপূর্ব্বে এই মহিমা এমনভাবে আর কেউ পরিবেশন করতে পারেননি। আবালবৃদ্ধ নরনারীর হৃদয়ে সেই পরম স্বরূপটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সুরের আলিম্পনে।

বিশ্বভাবনায় যাঁর প্রাণ উদ্বেলিত, জগতের ছোট বড় কোন কিছুকেই বাদ দিয়ে তাঁর দান বিস্তার করেনি। তিনি সেই প্রেমের ঠাকুরের প্রেমলীলা কীর্ত্তনের তরঙ্গের তালে তালে, খোলের বোলের সঙ্গে বিশ্বের জন্য কোলটী বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই কোলে আশ্রয় পেয়েছিল সকল মানুষ—শ্রেণী, বর্ণ, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে। বিশেষ ক'রে যারা আমাদের সমাজের আভিজাত্যের কাঠগড়ায় চিরকাল অপরাধী বলে পরিচিত, তারা

সেই বিশ্বজোড়া কোলের প্রেমস্পর্শে বেঁচেছিল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

তারপর তারা ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পেল কি সুন্দর পৃথিবী! নয়নে তাদের কে ধরিয়ে দিয়েছে চিরসুন্দরকে দেখার নেশা! সেদিন তারা পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে দেখতে পেল চিরসুন্দরের খেলা, ভাঙ্গা-গড়া, আরও কত কি। তারা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল জীবনের চরম সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। অন্নবস্ত্রের সমস্যা হয়ত তারা একদিন কায়ক্লেশে বা নানাভাবে সমাধান ক'রতে পারতো—কিন্তু অন্তর্জ্জীবনের এ সমস্যা যে বিশ্বজোড়া!

ফরিদপুরের অন্ত্যজ, উপেক্ষিত বুনোজাতি যারা সমাজের কোণঠাসা নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে খৃষ্টান মিশনারী দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত হ'তে ব'সেছিল, তাদের উন্নয়নকার্য্যে বাবাজী মহারাজ জগদ্বন্ধুর প্রধান সহযোগীরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রলেন কৈশোরের প্রারম্ভে।

তারপর চ'লল তাঁর নীরব সাধনা, কঠোর তপশ্চর্য্যা। বৃন্দাবনে নিভৃতে ব'সে ডুবে গেলেন তিনি লীলানুধ্যানে। সাধনায় তাঁর সম্ভাবনাময় রূপ দেখে শ্রীজগদ্বন্ধুর লোভ হ'ল তাঁকে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে দেবার জন্য। তাই একদিন প্রাণের রামদাসকে কাছে ডেকে বন্ধুসুন্দর ব'ললেন, "আপন আপন খাবারের জোগাড় তো পশু পাখীরাও ক'রে থাকে, দশজনকে খাইয়ে যে খায় সেই ত প্রকৃত মানুষ।" একে রামদাসজী ভুরিদাতা, তায় বন্ধুর আদেশ —যেন সোনায় সোহাগা। উত্তাল তরঙ্গ তুলে তিনি ছুটে চ'ললেন

সমাজকে ভাসিয়ে দেবার জন্য। খোল করতালের সুরতরঙ্গে, নিতাই-গৌর গুণগানে মাতিয়ে তুললেন বিহার উড়িষ্যা বাংলা।

ভারতের কত দূর দূরান্তে ঘুরে প্রেমের অফুরন্ত বীর্য্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন গণচিত্তে। যে প্রেমের বীর্য্যের দ্বারা জগতের সবকিছু বিধৃত, তা যে আমরা হারিয়েছি, মণিহারা ফণির অবস্থা যে আমাদের, এ পরম বার্ত্তা তিনি জানিয়ে দিলেন নিজের জীবন দিয়ে।

রামদাসজী 'বন্ধুর' ঐ "খাইয়ে খাওয়ানো" বাণীটির জীবন্ত মূর্ত্তি। চরণদাস বাবাজীর সংস্পর্শে তিনি এসে পড়েছিলেন তাঁর যৌবনে। প্রথম সাক্ষাতেই চোখে চোখে কত কথা হ'য়ে গেল। তারপর যেন কতকালের পরিচিতের কুশল প্রশ্নোত্তর। রামদাসজী চরণদাস বাবাজী মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়ে তুললেন কত গ্রাম নগর বাজার তার যেন ইয়ত্তা নেই। তাঁর সুর-সুরধুনীর তরঙ্গে কত নীরস হৃদয়ে প্রেমপ্রবাহ ব'য়ে গেল।

সে সময়ে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এক প্রবল আন্দোলন এসেছিল। একই সঙ্গে গোস্বামী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু, প্রেমানন্দ ভারতী, বাবাজী চরণদাস, প্রভৃতি মহাত্মাগণ আবির্ভূত হ'য়ে প্রেম ধর্ম্মের যে পুনরুজ্জীবন করেছিলেন তারই উত্তরসাধকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তরুণ রামদাস বাবাজী।

তদানীন্তন বৈষ্ণব জগতের যাঁরা মুকুটমণি তাঁদের প্রায় সকলেরই সাহচর্য্যে এসে রামদাসজী অশেষ কৃপালাভ করেন। এই সমস্ত কৃপার এক অখণ্ড স্রোত বেয়ে বাবাজী মহারাজ ভক্তকুলকে

ভাসিয়ে নিয়ে চললেন নিতাই-প্রেম মহাসমুদ্রের দিকে। সেই প্রেম মহাসমুদ্রে পড়ে কত জীবন ধন্যাতিধন্য হয়ে গেল! এই কপর্দ্দকশূন্য মহাবৈরাগী সাধক কত লুপ্তপ্রায়, কত পুণ্য বৈষ্ণবপীঠকে পূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত করে তুললেন! সেই সঙ্গে জাগিয়ে তুললেন সেই সব পুণ্যপীঠের মহিমাকে কীর্ত্তনের তরঙ্গে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই দান ভক্তসমাজ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে, তাই না তাঁর প্রতি আজ দিকে দিকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখা যাচ্ছে। তাঁর সান্নিধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঠাঁই পায়নি, জ্বলে উঠেছে প্রেমের দীপ। সেই দীপের আলোকচ্ছটায় কত না পাপাচ্ছন্ন অন্ধকার হৃদয় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই দীপ আজও জ্বলছে ভক্তের জীবন বেদীমূলে। বাবাজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি দীর্ঘদিন ধরে তার আলোকরশ্মি বিকীরণ করছে দিক্‌দিগন্তে।

মানুষ যখন সমাজের দুর্নীতির বিষবাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ তখনই তিনি এগিয়ে এলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষ তখনই নিতে পারল হৃদয় ভরে, যখন দেখল এই বাণীর যিনি পরিবেশক তিনি নিজে তা আচরণ না করে শুধু পরিবেষ্টাঠাকুরটি হয়ে বসেন নি।

জীবনটি তাঁর ঘড়ির কাঁটার মত চলত। যেদিন তিনি দেহত্যাগ করলেন সেদিন রাত্রি প্রায় ৯॥টা নাগাদ আমরা কয়েকজন তাঁর চরণসান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম।—দেহে তাঁর কোন জড়তাই ছিল না। প্রতিদিনই স্বভাবিকভাবে তিনি ভজনে ব্যাপৃত থাক্‌তেন। শেষের দিকে এক অতি প্রাচীন ভক্তকে একদিন বলেছিলেন—

"ওগো, বিরহেতেই সুখ" ইত্যাদি আরও কত কথা। কি জানি, তাঁর অন্তরঙ্গদের দারুণ বিরহ বেদনা সহ্য করতে হবে জেনেই কি তিনি কয়েকদিন যাবৎ এই কথা প্রায়ই বলতেন? দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে নরহরি সরকার ঠাকুরের সূচককীর্ত্তন করেন কত না উল্লাস ভরে। এই কীর্ত্তনই তার শেষ কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনে তিনি কত কত বিচিত্র আখর দিয়েছিলেন। তাতে ইঙ্গিত ছিল তাঁর প্রিয় ভক্তদের প্রতি—শ্রীগুরুকে সপ্রকটে ও অপ্রকটে কেমন করে ভজন করতে হয়। তাই তিনি একটি বিশিষ্ট আখর দিয়েছিলেন—

"নাম আর নামদাতা অভিন্ন।"

যিনি জগত জীবের দ্বারে দ্বারে কাঙালের বেশে নাম গান করে বেড়ালেন, আজ তাঁর পুণ্যলীলা আলোচনা করে তাঁরই পুণ্যময় সঙ্গলাভের আভাষটি আমরা উপভোগ করবো।

হরিদাসের নির্য্যাণ উৎসবে—

যেদিন আমার ভাগ্যাকাশকে সৌভাগ্যচন্দ্র কিরণ সুষমায় ভরপুর ক'রে তুলেছিল কানায় কানায় সেই দিনটি হ'চ্ছে ১৩৫৪ সনের ১২ই আশ্বিন, অনন্ত চতুর্দ্দশী তিথি। এই তিথিতেই ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ মহোৎসব।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার এক বিশেষ বন্ধু সংবাদ দিলেন, —যদি সম্ভব হয় তবে অফিস থেকে ছুটী নিয়ে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজের সঙ্গে এবার পুরী যেয়ো। ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও পুরী যাইনি। তার উপর সাধুসঙ্গমে, এতবড় একটি উৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য বড় কম নয়। হরিদাস ঠাকুরের উৎসব মাত্র একদিনের ব্যাপার। ৪।৫ দিনের ছুটী নিলেই যথেষ্ট। কিন্তু বাবাজী মহারাজের সঙ্গেই দেশে ফিরব এই আশায় পনের দিনের ছুটী নিলাম।

১০ই আশ্বিন শনিবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার ট্রেণে হাওড়া ষ্টেশন থেকে রওনা হলাম। আমরা প্রায় একশত লোক চ'লেছি রিজার্ভকরা কামরায়। কি আনন্দ! চিন্তা ভাবনা নেই। ট্রেণ উড়িষ্যা প্রবেশ ক'রে যে যে ষ্টেশনে থামে সেখানে কত দর্শনার্থী পূর্ব্ব থেকে জমায়েত হ'য়ে আছে বাবাজী মহারাজের দর্শনের জন্য। অতি সামান্যক্ষণই তাদের ভাগ্যে দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের সারল্য ও ভক্তি এত মধুর যে তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের

প্রাণের নিবেদন জানায় বাবাজী মহারাজের চরণে, কত সম্ভ্রমে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। তারপর ট্রেণ আবার এগিয়ে চলে তার গন্তব্যপথে দুর্ব্বার গতিতে। ভোরের হাওয়া বইছে। চোখে প'ড়ল কত ছোট ছোট ঢিবির মত পাহাড়। কোনটা বা অপেক্ষাকৃত বড়। মনে অনাবিল আনন্দ ধারা বইছে।

সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ পুরী ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে বহুভক্ত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ বাবাজী মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করলেন বিপুলভাবে। বাবাজী মহারাজ একটি প্রাইভেট মোটরে ঝাঁজপিঠা মঠের দিকে রওনা দিলেন। আমরাও পরে আশ্রমে এসে পৌঁছলাম। আমি ও আমার বন্ধুটি আশ্রমেই আস্তানা গাড়লাম। আমার মত অনেকগুলি তরুণ ছেলেকে পেয়েছিলাম কাছে। তার মধ্যে অনেকে কলেজের ছাত্র, আবার কেউ বা অফিস থেকে ২।৪ দিনের ছুটী নিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর স্নান করতে চললাম নিকটবর্ত্তী একটি পুকুরে। পথপ্রদর্শক হিসেবে যে ভক্তটি ছিলেন তিনি আমাদের দেখালেন কত আগ্রহভরে একটি মসজিদ। সে রাস্তা দিয়ে নগর সংকীর্ত্তন যাওয়ার সময় বাবাজী মহারাজ সেই মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। সে সময় মোল্লারা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করেন মসজিদদ্বারে কত না শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে। সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সাধু বৈষ্ণবের দর্শনলাভ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়; উদার বৈষ্ণবের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদই জগতে বৈষ্ণবতার সার্থকরূপ দিতে সমর্থ। জগত

কোন কালেই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। বাবাজী মহারাজের এই উদার ও সর্ব্ব ধর্ম্মে সমশ্রদ্ধাশীলভাব আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের এক উদার ভাব জাগিয়েছিল।

বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দ একটী পত্রে আমাকে জানিয়েছিলেন বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রলাম—"তিনি বক্তা নন, বাগ্মী নন, দুর্দ্দান্ত রাজনীতিক কর্ম্মী নন, মনে হয় নিরীহ গোবেচারী শুধু ভগবানকে সার করেছেন। কিন্তু কি শক্তিই না অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এই নিরীহ লোকটীর মধ্যে প্রবাহিত। যাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব কৃষ্টি—আজ উচ্চশির ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ সত্য কল্পনা-বিলাসের সত্য নয়। এ ঐতিহাসিক সত্য। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় অনেকক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ হয়েছে। সংকীর্ত্তনের সময় রাজপথে বা পরিক্রমাপথে মন্দির ও মসজিদের সম্মুখে, গীর্জ্জা ও গুরুদ্বারের সম্মুখে আনতমস্তকে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন ক'রে তবে অগ্রসর হন। এতে এক অপূর্ব্বতার সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন ভাবে সকলের চিত্তেই প্রকটলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সকলস্থানেই তিনি অনন্ত ভাবময় পরমপুরুষেরই উপলব্ধি ক'চ্ছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও তিনি পরম ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর অনুগামী কয়েকজন ভিন্ন আর কয়জনের জীবনে এইরূপ উদার সমন্বয়ভাব প্রকটিত হ'য়েছে তা জানি না।"

আমরা সেদিন স্নানান্তে বেলা ১১টা নাগাদ আশ্রমে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম ক'রে নিলাম। বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজ

সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্রীশ্রীহরিদাস সমাধিমন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলেন। আমরাও বিছানাপত্র নিয়ে উক্ত মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। রাত্রিটা ওখানে কাটাতে হবে। কল্য প্রভাতে উৎসবকৃত্য। জগন্নাথের সিংহদ্বার পার হয়েছি, এমন সময় কাণে ভেসে এল ভীষণ গুরু গুরু শব্দ—যেন কতকগুলি কামান একসঙ্গে গর্জ্জন ক'রছে। প্রথমে ত ভেবেই অস্থির কিসের এই তর্জ্জন গর্জ্জন। সঙ্গের বন্ধুটি কিসের গর্জ্জন জিজ্ঞাসা করায় আমি ত নিরুত্তর। ক্রমে সমুদ্রতীরে এসে দেখি কি বিশাল অনন্ত জলরাশি ও তার বিরামহীন ঢেউ! বহুক্ষণ ধ'রে সমুদ্রের এই লীলাখেলা দেখে যখন হরিদাস সমাধিমন্দিরে এসে পৌঁছলাম তখন হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন হ'চ্ছে আর বাবাজী মহারাজ দর্শন ক'রছেন। কল্য হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসব হবে।

যবন হরিদাসের অনবদ্য চরিত্র অধ্যাত্মজগতে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। বৈষ্ণব জগতে তিনি নামসাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ রূপে পূজিত। কাজীর শাসনকে তিনি নীরবে গ্রহণ ক'রে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন—

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ
যায় যদি প্রাণ।
তথাপি না ছাড়িব
বদনে হরিনাম॥

রূপসী গণিকা হীরা জমিদার রামচন্দ্র খান কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'য়েছিল ভক্ত হরিদাসকে পরীক্ষা করবার জন্য। শেষকালে

হরিদাসের নামের প্রভাবে সেও মহাবৈষ্ণবী হ'য়েছিল। তাঁর পরিচয় সামান্য লেখনী কি দিতে সমর্থ? একদিন এক ভক্ত বাবাজী মহারাজকে জানালেন—বাবা! আমার নাম জপ করতে ইচ্ছা হয় না, গতানুগতিকভাবে করি বটে কিন্তু তাতে প্রাণ খুঁজে পাই না। তার উত্তরে বাবাজী মহারাজ ব'ললেন—ওসব যার জিনিষ তার কাছে জেনে নিতে হয়। প্রথমে নামে নিষ্ঠা তবে ত নাম ক'রে রস পাবে? নাম-নিষ্ঠার মূর্ত্ত বিগ্রহ হরিদাস ঠাকুর। আগে তাঁকে স্মরণ ক'রবে তবে নাম ক'রে সুখ পাবে।

চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুযায়ী হরিদাসের দেহত্যাগের উপক্রম থেকে সমাধিকাল ও উৎসবকৃত্য পর্য্যন্ত তিন দিনের কথা।—উক্ত বর্ণনানুযায়ী বাবাজী মহারাজ আশ্রমবাটী থেকে নাম নিয়ে গম্ভীরায় এসে হাজির হ'লেন। গম্ভীরা-নামের সঙ্গে স্থানের তাৎপর্য্য অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ীর এমনই নিভৃত মহলে এই স্থানটি অবস্থিত যে, বাইরের কোন কোলাহলই প্রবেশ করতে পারে না। অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ ও রামরায় সনে শ্রীমন্মহাপ্রভু রস আলাপনে মগ্ন থাকতেন এই গম্ভীরায়।

"অন্তরঙ্গ সঙ্গে করেন রস আলাপন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করেন নাম সংকীর্ত্তন॥"

গম্ভীরাগৃহে মাত্র এক-দেড় হাত লম্বা একটী জান্‌লা। এখানে প্রভুর একটী চিত্রপট, ব্যবহৃত খড়ম ও কন্থা আজও রক্ষিত আছে। দিবারাত্র একটী প্রদীপ জ্বলছে। কারণ, দিনেও

মধ্যরাত্রির মত স্থানটী অন্ধকার। এই গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন ধরলেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম
(আমাদের) এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম"
প্রাণ ভরে বল ভাই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সীতানাথের প্রাণনিধি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নদীয়া বিনোদিয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গদাধরের প্রাণবঁধূয়া—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নরহরির চিতচোরা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইত্যাদি

এক একটি বিশেষণ দিয়ে এমনই কৃষ্ণচৈতন্যের জয় দিচ্ছেন তিনি যে, যাদের চৈতন্যচরিত ভালভাবে অধ্যয়ন করা আছে তাদের চোখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ বিশেষ পার্ষদসনে বিশেষ লীলাগুলি ফুটে উঠছে ছবির মত। সব শেষে তিনি আখর দিলেন, "হরিদাসের বাসনা পূরণকারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। এবার বাবাজী মহারাজ ভাবভরে অধীর হ'য়ে প'ড়লেন। কণ্ঠরুদ্ধ—বহুক্ষণ নিস্তব্ধ—তারপর হুঙ্কারে হুঙ্কারে ভাবের উচ্ছ্বাস ছুটতে আরম্ভ হ'ল। নয়নধারায় ভেসে উদাত্ত কণ্ঠে আখর দিলেন—

হা গৌর প্রাণ গৌর! একবার দেখা দাও, আজ হরিদাসের বাসনা পূরণের দিন। শ্রীগুরুমুখে শুনেছি—ত্রিকাল সত্য লীলা তোমার—

শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় দেখব ব'লে এসেছি—
ত্রিকালসত্য লীলা জেনে আশায় আশায় এসেছি—
আশা পূরণ করবে কি?

ও মহাভাব—প্রেমরসবারিধি, আশা পূরণ করবে কি ?
(স্বরূপাদি) প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে, তেমনি ক'রে চল প্রভু।
হরিদাসের বাসনা পুরাইতে, তেমনি ক'রে চল প্রভু ॥
তোমার ভকত-বাৎসল্য-লীলা, প্রাণ ভ'রে দেখব মোরা।
পাগলা প্রভুর পিছে থেকে, প্রাণ ভ'রে দেখব মোরা।
শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে, প্রাণ ভ'রে দেখব মোরা।
তোমার প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে, তেমনি ক'রে চল প্রভু!

"হরিদাসের বাসনা পুরাইতে, যায় প্রভু নিজগণ সাথে"—এই পদটিকে কণ্ঠে নিয়ে তিনি গম্ভীরা থেকে সমগ্র ভক্তদলটি সহ হাজির হলেন সিদ্ধ বকুলে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। তিলধারণের স্থান নেই। তারপর বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ বকুলবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ক'রে কীর্ত্তনে বসলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একাদশ পরিচ্ছেদের "হরিদাস নির্য্যাণ অধ্যায়" দেখে তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন।—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য
জয় দয়াময়।
একবার প্রাণ ভরে জয় দাও ভাই—
ভক্তবৎসল গৌরহরির, প্রাণ ভ'রে জয় দাও ভাই।

আখরে আখরে চ'লল বিস্তার। গৌর লীলা অনন্ত, ভাব অনন্ত, আবার ভাষাও অনন্ত। তাছাড়া, বাবাজী মহারাজ চৈতন্য-চরিতামৃত দেখে যে কীর্ত্তন করছিলেন তার একটা নিজস্ব সুর-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সুরের প্রবর্ত্তকও তিনিই। চৈতন্যচরিতামৃত

রচিত ন্যূনাধিক চারশ বৎসর পূর্ব্বে। তখনকার ভাষা আর এখনকার ভাষা কত তফাৎ। তাতে আবার সুরসংযোজনা ক'রে আধুনিক রুচিবান লোকের প্রাণে রসের ফোয়ারা ছোটান কত বড় সুরবিদ্ হ'লে সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। বাবাজী মহারাজের কি এক অদ্ভুত ক্ষমতা যে, তিনি সমগ্র জনতাকে বর্ণনাভঙ্গীর বৈচিত্র্যে ও লীলানুষ্ঠানে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের আর্ত্তিটী এমনভাবে সংক্রামিত ক'রছেন যে সকলের নয়ন আজ অশ্রুসজল, হৃদয় বিরহোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এবার কীর্ত্তন চ'লল—

"একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হইয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ হরিদাসকে দিতে এসে শুনলেন—তিনি আজ কিছু আহার গ্রহণ করবেন না। কারণ তাঁর নিত্যকৃত্য তিনলক্ষ জপের সংখ্যা পূরণ করতে পারছেন না। এদিকে মহাপ্রসাদ এসেছেন কেমন করেই বা উপেক্ষা ক'রবেন—

এতবলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
একরঞ্চ লইয়া তার করিল ভক্ষণ॥

বাবাজীমহারাজ আখর দিলেন—

এমন ভজননিষ্ঠা না হইলে,
এমন নামে রুচি না হইলে,
শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে?
তাই বলেছেন কবিরাজ—
"সেই নামামৃত বিনে

যদি খায় অন্নপানে,

তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।"

তাই কণিকামাত্র গ্রহণ ক'রে হরিদাস মহাপ্রসাদের সম্মান রক্ষা ক'রলেন। এ সংবাদ গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জানালেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথের মঙ্গলারতি দর্শন ক'রে হরিদাসকে নিত্য দেখা দিতে আসতেন। হরিদাসের এতই দৈন্য যে রাস্তায় বার হতেন না—পাছে মন্দিরের সেবকরা তাঁকে ছুঁয়ে দেবসেবা করে। তাতে তিনিই অপরাধী হবেন এই আশঙ্কায় গম্ভীরার নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জনতম জঙ্গলে সাধনের স্থান নির্ব্বাচন ক'রেন। রোদ বৃষ্টি শীতে হরিদাস এই অনাবৃত স্থানে সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন।

এদিকে ভক্তবৎসল প্রভু, হরিদাসের কষ্ট হ'চ্ছে, কি ক'রে তাকে রক্ষা করা যায় এই চিন্তায় ব্যথাতুর হ'য়ে উঠলেন। হরিদাসের দেহস্মৃতি ছিল না। নিশিদিন নামরসে মত্ত থাকতেন। কিন্তু প্রভুর হৃদয় তা শুনবে কেন? ভক্তের কষ্টে তার সমধিক দুঃখ। তাই একদিন শ্রীজগন্নাথের বকুলবৃক্ষের প্রসাদী দাঁতন কাঠি নিয়ে, তাতে নিজের শক্তি সঞ্চার ক'রে হরিদাসের সাধন প্রাঙ্গণে রোপণ করলেন। সেই দাঁতনকাঠিই বৃহৎ বকুলবৃক্ষরূপে হরিদাস ঠাকুরকে রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা ক'রত। এ স্থান ছেড়ে তিনি কোথাও যেতেন না। অদ্যাবধি সেই বকুলবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। স্থানটী সিদ্ধবকুল নামে খ্যাত। এই স্থানটির সেবাসৌষ্ঠব বজায়ের মূলে রয়েছে বাবাজী মহারাজের প্রাণময় দান।

হরিদাস দৈন্যবশে মন্দিরে যেতেন না—তাই বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে আখর দিলেন—

'—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে,
হরিদাস যান না অচলে দেখ্তে,
দেখবার সাধ করে, কিন্তু দৈন্যবশে—
হরিদাস যান না অচলে দেখ্তে,
তাই সচল আসে দেখা দিতে।
—তুই স্বরূপে বিহরে! লীলাময় শ্রীবিগ্রহ,
সচল আর অচল, গৌর আর জগন্নাথ,
এই তুই স্বরূপে বিহরে। তুই স্বরূপে তুই দান।—
সচল দানে নাম-প্রেমামৃত—আর অচল দানে অধরামৃত।
অচল দেখতে আসে না হরিদাস, তাই সচলরূপে পুরায় আশ।
হরিদাসে দেখা দিবার আশে, প্রভু আমার নিতুই আসে।—

সমবেত জনতা এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব আস্বাদন মাধুর্য্যের পরম ও চরম রহস্য কথা বাবাজী মহারাজের মুখে শুনে বিস্ময়বিহ্বল! বাবাজী মহারাজের কি উল্লাস। শ্রীমুখ তাঁর ভাবভরে আরক্ত। যেন হৃদয়ের দুয়ার খুলে মহাদানীর আস্বাদন মাধুর্য্য বিলোতে ব'সেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কখন নীরবে অশ্রুবর্ষণ, কখনও বা বালকের ন্যায় রোদন। বহুক্ষণ আবিষ্ট। তারপর একটু সম্বিৎ ফিরতেই আবার আখরে আখরে চ'লল তাঁর ভাবের বিস্তার।—

'—প্রাণ গৌর লীলারহস্য! কিছু বুঝা তো যায় না।
দেখা দিতে আসে, কি—দেখতে আসে!

কিছু বুঝা ত যায় না।
শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায়,
প্রাণে প্রাণে এই ত জাগে।
বড় ভোগী গৌর আমার, ভোগ ছাড়া থাকে না।
এবার লীলার এই ধারা,
অন্তর বাহ্য দুইরূপ।
অন্তরে রস আস্বাদন,
বাহিরে জীব উদ্ধারণ।
উদ্দেশ্য—নিজ মাধুরী আস্বাদন,
আনুষঙ্গে নামপ্রেম বিতরণ।

বিশেষ রস আস্বাদন আশে,
গৌর আমার দেখতেই আসে।
অশেষ বিশেষে আপনায় আস্বাদিতে,
এবার লীলা গৌরাঙ্গ রূপেতে।
হরিদাসে দেখাই গৌর আশয়,
দেখতে আসা মর্ম্ম নয়।
দেখতে এলে দেখা দেওয়া,
আনুষঙ্গে হয়ে যায়।
প্রাণ গৌরাঙ্গের মনের ভাব,
এই ত হয় অনুভব।
হরিদাসে দেখতে গৌর আসে।—

বাবাজী মহারাজ আজ দানব্রতে মেতে উঠেছেন। কিছুতেই

নিজেকে সংযত ক'রতে পারছেন না। সারা অঙ্গ কাঁপছে কি এক ভাবের তরঙ্গে। সমবেত জনতার তনু মন প্রাণ বিহ্বল হ'য়ে গেছে ভাব মাধুর্য্যে। একটীর পর একটী আখর যেন তরঙ্গে তরঙ্গে আলোড়িত ক'রে তুল্‌ছে ভাবসমুদ্র।

হরিদাসকে গৌর কেন দেখতে আসে? এর অর্থ কি? প্রশ্ন কর্ত্তা কিন্তু নিজেই আবার কেমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুসিদ্ধান্তটি রসে পরিমার্জ্জিত করে পরিবেশন করছেন সুললিত আখরের মাধ্যমে। একেই বলে স্বভাবকবি। সুর মান তান লয় কোনটাই তাল ভেঙ্গে চ'লছে না। তার উপর ভাব ও ভাষার সংযোজনা চ'লেছে পর পর অপরূপ ভঙ্গীতে। আখরের পর আখর তিনি গেয়ে যেতে লাগলেন—

'—জগন্নাথে দেখি হরিদাসে দেখ্‌তে
কি লোভেতে আসে বল?
শ্রীগুরু—প্রেরণায় এই ত জাগে—
নিতুই নিতুই গৌর আমার,
মঙ্গল-আরতি দর্শন করে।
অভিলষিত স্বরূপ দেখবার তরে,
নিকুঞ্জ-বিহার-জনিত-চিহ্ন-যুত,
বড় শৃঙ্গার ভোগের তরে,
মঙ্গল আরতি দর্শন করে।
আরতিতে দেখি জগন্নাথ মাধুরী,
যা ভোগ হয় প্রাণগৌর কিশোরীর,

তা ত তার বুকে জাগে।
শুধু বুকে জাগা নয়—
সেই ভোগ মাধুরী,
সর্ব্বাঙ্গেতে বিকাশ হয়।
বিশেষ বিকাশ শ্রীমুখেতে।
ভাব রাজ্যের এই ত স্বভাব।
বুকে যা ভোগ হয়,
মুখেতে তা প্রকাশ পায়।
রসিক যে জন হয়,
মুখ দেখে বুক ভোগ করয়।
যে ভোগ হয় তার অন্তরে,
গৌরের শ্রীমুখেতে ঝলমল করে।
তাতে হয় অপূর্ব্ব স্বরূপ।
সেই ভোগ আবেগে গৌরহরি,
হরিদাসের সম্মুখে এলে,
হয় তাতে প্রতিবিম্বিত।
হরিদাস যে স্বচ্ছ দর্পণ!
হয় তাতে প্রতিবিম্বিত।
নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ে পশিয়া,
দেয় তারে মাতাইয়া।
গৌরের ভোগ মাধুরী ভোগ করে,
হরিদাস নব আনন্দ ভোগ করে।
'—সেই নব ভোগ উল্লাস হরিদাসের শ্রীমুখে হয় বিকাশ।

হরিদাসের বুকের ভোগ, ফুটে হরিদাসের মুখে। প্রাণ গৌর আমার তাই দেখে। নিজ ভোগের কি মাধুরী! কখন ভোগ-ক'রতে ত পায় না। হরিদাসের বদন হেরে, নিজ ভোগ মাধুরীর ভোগ, (আজ তাই) অনিমিষে গৌর দেখে। নিতুই নিতুই গৌর আমার, তাই ছুটে ছুটে আসে। জগন্নাথ দরশন হ'তেও হরিদাস দরশনে, বুঝি অধিক সুখ পায়। ভোগলিপ্সু গৌর আমার, নৈলে বা আসবে কেন, লুব্ধ হ'য়ে সেই ভোগে? গৌরের অন্তরে বাসনা জাগে। আমি যদি হরিদাস হ'তাম, নিরন্তর আস্বাদিতাম। আমার এই ভোগ মাধুরী! সদা ভোগ ক'রতে পেতাম।'

শ্রোতাদের মনে যেন নেশা লেগে গেছে। তনু মন প্রাণ এক ক'রে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে আছে এরপর কি আখর প্রকাশ পাবে এই আশায়। সাধু গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতিরেকে ভাবসমুদ্রে প্রবেশ ঘটে না। চৈতন্য-চরিতামৃতের মর্ম্মোদ্ধার কেবল পাণ্ডিত্যের কচকচির দ্বারা সম্ভব নয়। ভাষার অনুশীলনে ব্যাখ্যার দ্বারা উপর-ভাসা অর্থটিই সম্ভব, তাই বাবাজী মহারাজ একদিন কথা-প্রসঙ্গে ব'লেছিলেন—"এ সব গ্রন্থ প'ড়বার আগে, শ্রীগুরুচরণ স্মরণ ক'রে, গ্রন্থটি বুকে ধরে গ্রন্থকর্ত্তার কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা ক'রতে হয়—'তুমি আমায় কৃপা ক'রে মর্ম্মার্থ অনুভব করাও!' তবেই ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের সার্থকতা।"

বাবাজী মহারাজ চৈতন্য-চরিতামৃতের এক একটি কথাকে ধ'রে তার ভাবরাজ্যের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন সমগ্র জনতাকে।

গৌরসুন্দর হরিদাসকে দেখতে আসেন কি লোভে ? তা হ'চ্ছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গল আরত্রিক দর্শন ক'রে, গৌরের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। হরিদাসের কাছে এলে সে ভাবটি হরিদাসস্বরূপ স্বচ্ছ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। তখন হরিদাস ভাবমাধুর্য্যে মেতে ওঠেন। হরিদাসের মুখে সে ভাবটি ফুটে ওঠে, তাই গৌরসুন্দর নিজ ভাবের কি মাধুরী তা দেখতে পান হরিদাসের বদনে। অনমিখে তাই হরিদাসের বদনপানে চেয়ে থাকেন। এই লোভেই গৌরসুন্দর রোজ ছুটে আসেন হরিদাসকে দেখতে। এই ভাবের আখর চ'লল কত না উল্লাসভরে।

কি অদ্ভুত পরিবেশন ভঙ্গী। সকলেই আত্মহারা! কি মধুর অনুভূতির প্রেমস্পর্শ এনে দিয়েছেন যে, পাষণ্ডীও মেতে যাচ্ছে আস্বাদন মাধুর্য্যে। মহাপুরুষের এমনই বৈশিষ্ট্য যে অযোগ্যকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে যোগ্য ক'রে নিয়ে তবে তা পরিবেশন করেন।

—আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তাঁর শারীরিক কুশলবার্ত্তা।

হরিদাস যুক্তকরে মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন—

"শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হেঁয়ালিপত্রের কথা শোনা অবধি আমি বুঝতে পেরেছি যে, তুমি শীঘ্রই লীলা সংগোপন করবে। আমার নিবেদন যে, তোমার এই লীলা প্রকাশের পূর্ব্বেই যেন আমি এ দেহ ত্যাগ করতে পারি।"

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—হরিদাস! তোমার যা প্রার্থনা —"কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে।"

কিন্তু—"আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লইয়া।
তোমার যোগ্য নহে যাও আমারে ছাড়িয়া।"

এতে ঠাকুর শ্রীহরিদাস অতি বিনয়নম্র বচনে জানালেন—

"মোর শিরোমণি যত মহা মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহাঁ হানি হইল॥"

তারপর মহাপ্রভু সেদিনকার মত বিদায় নিলেন। হরিদাসের প্রার্থনানুযায়ী পরদিবস অতি প্রত্যূষে বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে সিদ্ধ-বকুলে উপস্থিত হলেন। হরিদাস প্রভুর চরণ বন্দনা ক'রলেন।

তখন— "প্রভু কহে—হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে—যে ইচ্ছা তোমার॥"

হরিদাস ব'ললেন—প্রভু! আমার বাসনার কথা ত তোমায় পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ভক্তবাৎসল্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ প্রভু ভক্তের বাসনা পূরণে বাধ্য! তাই হরিদাস দেহত্যাগকালে যেরূপভাবে প্রভুকে পেতে চেয়েছিলেন সেই মতই করতে হ'ল—

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥"

হরিদাস তাঁর প্রার্থনানুযায়ী দেহত্যাগকালে প্রভুর চরণ দুটি নিজ বক্ষে ধারণ ক'রে নয়ন দুটি গৌরমুখপদ্মে নিবদ্ধ ক'রলেন, আর মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ উচ্চারণসহ দেহত্যাগ ক'রলেন।

এ লীলাটি কীর্ত্তনকালীন সমবেত জনতার প্রাণে হরিদাসের বিরহোচ্ছ্বাসটি যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্তরে নেমে এল। বাবাজী মহারাজের ক্রন্দন ধ্বনি এমনই এক করুণ সুরকে নিবিড় ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল যে শ্রোতাদের নয়ন হ'ল অশ্রুসজল আর হৃদয় বেদনায় আর্ত্ত। বাবাজী মহারাজের সেই ক্রন্দনোচ্ছ্বল বদন সাক্ষাৎ লীলানুভূতির প্রেরণা যোগায়। হুঙ্কারে হুঙ্কারে ভাবের উচ্ছ্বাস ছুটছে ও অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার যুগপৎ বাবাজী মহারাজের অঙ্গে শোভা পাচ্ছে। এ যেন এক কান্নার হাট ব'সে গিয়েছে। অদ্ভুত বাবাজী মহারাজের জীবনব্যাপী এ প্রেম সাধনা! একেই বলে ভূরিদান। নিজে ভোগ-মাধুর্য্যে মেতে উঠেছেন আর অকৃপণ হ'য়ে সেই আপার্থিব ভোগকে বিলাচ্ছেন অপরূপ ভাব ও সুরের ব্যঞ্জনায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরদের মধ্যে এরূপ গৌরবময় স্বচ্ছন্দ মহাপ্রয়াণ আর কারও জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না। হরি-দাসের দেহ ঘিরে ভক্তগণ বিরহক্লিষ্ট হৃদয়ে উচ্চসংকীর্ত্তন ক'রছেন।

কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু কি এক অভিনব ভাবে বিহ্বল। প্রভু হরিদাসের দেহ কোলে ক'রে প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে নাচ্ছেন। অতি অন্তরঙ্গ ভক্তের দেহত্যাগে মহাপ্রভুর কেন এই কীর্ত্তন-উল্লাস? বাবাজী মহারাজ আখর দিলেন—

এযে বড় বিরুদ্ধ ভাব,
হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভুর উল্লাস,
—এ যে বড় বিরুদ্ধ ভাব।
প্রভুর দুঃখ হবার কথা
তবে কেন আনন্দ ?
দুঃখের পরিবর্ত্তে তবে কেন আনন্দ ?
হরিদাসের চরিত্রে ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল,
নামের মহিমা প্রচার ব্রত
উদ্‌যাপন হ'ল।
তাইতে প্রভুর আনন্দ !

এবার ভক্তগণ প্রভুকে প্রকৃতিস্থ ক'রে হরিদাসের দেহ ব'য়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রের জলে হরিদাসের দেহটিকে স্নান করানো হ'ল। প্রসাদ এবং চন্দন অঙ্গে লেপন করা হ'ল। উক্ত বর্ণনামতই বাবাজী মহারাজ সমগ্র জনতা সমেত সিদ্ধবকুলের স্থান থেকে সমুদ্রতীরে এলেন এবং যথাযোগ্য অনুষ্ঠানসহ এ বিষয়গুলি কীর্ত্তন ক'রতে থাকলেন। তারপর হরিদাসের সমাধি-মন্দিরে গিয়ে সমাধিদান অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কীর্ত্তন ধ'রলেন—

"হরিবোল হরিবোল বোলে গোরারায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তার গায়॥

তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল ॥"

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ হস্তে বালুকার গর্ত্ত করে হরিদাসের দেহটীকে সমাধিস্থ করেন এবং সেই স্থানে একটি পিণ্ডা নির্ম্মাণ ক'রে ভক্তের উপযুক্ত মর্য্যাদাস্বরূপে তা' রক্ষা করেন। বলিহারী ভক্তবাৎসল্য! অদ্যাপিহ এই সমাধি স্থানটি পরম মর্য্যাদার সহিত সেবিত হ'চ্ছে।

সেদিন এ পবিত্র সমাধিস্থান ঘিরে ভক্তদের উচ্চকণ্ঠের কীর্ত্তন আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে তুলল। বেলা ১২টা নাগাদ বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন সমাপ্ত হ'ল।

বৈকালে বাবাজীমহারাজ দলবল সমেত জগন্নাথের সিংহদ্বারে চলেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের মহোৎসবের জন্য আঁচল পেতে ভিক্ষা ক'রছেন—এই লীলাটি কীর্ত্তন করার কালে বাবাজী মহারাজের কণ্ঠে এক অপূর্ব্ব আর্ত্তি জেগে উঠলো। তিনি ভাব-গদগদ কণ্ঠে আখর দিলেন—

পসারি আমায় ভিক্ষা দেরে—
গৌর দাঁড়ায়ে বলে এই সিংহদ্বারে,
পসারি আমায় ভিক্ষা দেরে।
হরিদাসের মহোৎসবের তরে
পসারি আমায় ভিক্ষা দেরে।
আজ বিশ্বম্ভর ভিখারী,
বিশ্বের পালন পোষণ কর্ত্তা (সেই),

বিশ্বম্ভর আজ ভিখারী।
হরিদাসের প্রেমে বাঁধা পড়ি
আজ বিশ্বম্ভর ভিখারী।
যাইরে লীলার বলিহারী,
আজ বিশ্বম্ভর ভিখারী—
ইত্যাদি।

ভক্তের আহ্বানে ভগবানকে বৈকুণ্ঠের আসন ছেড়ে যে কতবার ধরার ধূলায় নেমে আসতে হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেদিন ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তবিরহে জগন্নাথের সিংহদ্বারে আঁচল পেতে ভিক্ষা করছেন। শ্রীভগবান নিজেই ব'লেছেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।" শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের মুখে—ঐ ভগবদুক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন—

"কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে ?
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে।"
"সকল সুহৃদ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ-যোগ্য নহে॥
তেহো পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন বংশের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা নিবাসে॥"

হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণকে উপলক্ষ্য ক'রে ভক্তের মহিমা সেদিন এক অভিনব দৃশ্যের মধ্যে ধরা দিল। সিংহদ্বার জনসমুদ্রে নিমজ্জিত। দূর দূরান্ত থেকে আগত নরনারী কীর্ত্তন শুনার জন্য ব্যাকুল। মহাপ্রভুর সেই ভক্তবাৎসল্য আর হরিদাসের জীবনাদর্শ বর্ণনে আজ বাবাজী মহারাজ পঞ্চমুখ। পঞ্চসপ্ততিতম বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর সমগ্র কোলাহলকে অতিক্রম ক'রে উর্দ্ধে ওঠে ও সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। কত অভিনব ছন্দে ভক্তবাৎসল্য লীলার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার বেজে যায় সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে।

সিংহদ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভিক্ষা ক'রছেন দেখে পসারিরা প্রভুকে ভিক্ষা দিচ্ছে নিজ নিজ সৌভাগ্যে আত্মহারা হ'য়ে। স্বরূপ গোঁসাই তাদের নিবৃত্ত করে প্রভুকে বাসায় পাঠালেন। নিজে সঙ্গে চার জন বৈষ্ণব নিয়ে প্রত্যেক পসারির কাছ থেকে কিছু কিছু প্রসাদ ভিক্ষা ক'রে বাসায় ফিরলেন। প্রভু নিজে সেই প্রসাদ পরিবেশন ক'রছেন সমাগত বৈষ্ণবদের কত না আনন্দে। স্বরূপ গোঁসাই প্রভুকে নিবৃত্ত ক'রে নিজে পরিবেশন আরম্ভ ক'রলেন। প্রভু প্রসাদ গ্রহণ না করলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাবেন না, সেজন্য সকলেই অপেক্ষা ক'রছেন। কিন্তু প্রভুর কাশীমিশ্রের বাড়ীতে ভিক্ষা করার জন্য নিমন্ত্রণ। পুরীভারতীর সঙ্গে প্রভু সেই প্রসাদ ভিক্ষা ক'রলেন। তখন সকল বৈষ্ণব প্রসাদ পেতে আরম্ভ ক'রলেন। ভোজনান্তে প্রভু নিজে সকলকে মাল্য ও চন্দনে ভূষিত ক'রে প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে এই বর দান করেন—

"(আমার) হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥

যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মহোৎসবে যেই করিল ভোজন ॥
অচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
(আমার) হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি ॥"

সিংহদ্বারে গৌরের ভিক্ষা-প্রসঙ্গটী কীর্ত্তনের সময় পসারিরা বাবাজী মহারাজকে ভারে ভারে প্রসাদ ভিক্ষা দিচ্ছে। আবার সমাগত নরনারীও পসারিদের কাছ থেকে প্রসাদ কিনে ভিক্ষা দিচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রচুর প্রসাদ স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠল। এ লীলানুস্মৃতি যেন প্রকট লীলার পুনরভিনয়ের পর্য্যায়ে এসে তখন দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষালব্ধ প্রসাদ ভক্তবৃন্দের মস্তকে ভারে ভারে শোভা পেতে থাকল।

বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন সহ হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে এসে হাজির হ'লেন। আবার সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনে ব'সলেন, হরিদাস নির্য্যাণ কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে গীত হ'ল। তারপর সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে ছাদে ভক্তবৃন্দ ব'সে গেলেন প্রসাদ পেতে।

অপরূপ শোভা ধারণ ক'রেছে ভক্তবৃন্দের বিরাট সম্মেলনে। অসংখ্য বৈষ্ণবের একত্র সমাবেশ। এরূপ ভোজনরঙ্গ দেখা সত্যই এক সৌভাগ্য। বাস্তবিকই উপভোগ্য এবং স্মরণীয়। মহাপ্রভুর লীলাগুলিকে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ক'রে গণচিত্তে জাগিয়ে রাখা ধর্ম্ম-সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বাবাজী মহারাজের কত বড় দান তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ দানের পিছনে গৌরগত প্রাণই একমাত্র অবলম্বন। এই কপর্দ্দকশূন্য ভিখারী বৈষ্ণব গুরুদত্ত একজোড়া করতালের মধুঝঙ্কারে বৈষ্ণবকৃষ্টিকে জাগিয়ে তুললেন

এক অভিনব মহিমায়। হরিদাস ঠাকুরের মহিমা সেদিন কীর্ত্তন ক'রতে গিয়ে তিনি সেই মহিমাকে জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন নবতর মাধুর্য্যে।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দিরটি ক্রমে রামদাস বাবাজী মহারাজের সেবাধিকারে কি ভাবে এসে পড়ে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা ক'রে এ অধ্যায়টি শেষ ক'রব। সে বহুদিন আগের কথা। শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর (বড় বাবাজী মহারাজের) শিষ্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী (কলুটোলার বিখ্যাত ধনী ৺গোপাল লাল শীলের স্ত্রী) পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা দেখ্‌তে এসেছেন। সেই সূত্রে একদিন তিনি ঝাঁজপীঠা মঠে বড় বাবাজী মহারাজকে জানালেন, সেবানুকূল্যে কিছু অর্থদান করতে চান। তদুত্তরে বড় বাবাজী মহারাজ তাঁকে সময়ান্তরে জানাবেন ব'লে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু চরণদাসজীর প্রকটকালে সে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশই ভক্ত মহিলাটি পেলেন না।

তারপর বহুদিন কেটে গেল। এর পর হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের সেবা নিয়ে নানা গণ্ডগোল উপস্থিত হ'য়েছে। সেবা অতি দীনভাবে চলছে। সব দেনার দায়ে নিলামে উঠবার উপক্রম হ'য়েছে। এ খবরটি বাবাজী মহারাজের কর্ণগোচর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জনরবও শোনা গেল যে, কোন পাঞ্জাবী নাকি প্রমোদভবন ক'রবে ব'লে স্থানটি কিনবার জন্য উদগ্রীব।

বাবাজী মহারাজের হৃদয় এই পবিত্রস্থান সংরক্ষণের জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। তদানীন্তন সেবাইত তাঁকে জানালেন

যে, প্রায় চার হাজার টাকা হ'লে তিনি এই স্থানটি অন্য কোথাও বিক্রী না ক'রে বাবাজী মহারাজকে দিতে রাজী আছেন। ভিখারী বৈরাগী অত টাকা পাবেন কোথায়? অথচ কলকাতায় ভক্ত ও ধনীরূপে পরিচিত অনেকে আছেন। তখন বহরমপুরে রাজা মণীন্দ্র নন্দীর ভবনে বৈষ্ণব সম্মেলন চ'লছে। বাবাজী মহারাজ ভাবলেন, সব কথা এঁদের জানালে যদি কিছু ফল হয়। কিন্তু ভিখারী বৈষ্ণবের কথা কে শুনবে তাঁর প্রাণের দেবতা ছাড়া! প্রথমে কলকাতার বহু ধনী বৈষ্ণব তাঁকে নানাবিধ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে কারো পাত্তা পাওয়া গেল না। দরজায় দরজায় ঘুরে বিফল হ'য়ে মনে অভিমান হ'ল। সংকল্প ক'রলেন, আর কারও কাছে যাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও স্থির ক'রলেন যে, এর কিছু সুব্যবস্থা না হ'লে অন্নগ্রহণ ক'রবেন না।

সেদিন সকাল থেকে জলগ্রহণ করেননি। বেলা প্রায় উৎরে এসেছে। নানা যায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রথমে সিমলার অতীন বসুর বাড়ী এলেন। তিনি রামদাদার মুখ শুকনো দেখে নানা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রলেন কিন্তু কিছু বলা হ'ল না। শেষে মির্জ্জাপুরে বিহারীদাস বাবাজীর আখড়ায় এসে হাজির হ'লেন। তিনি রামদাসকে দেখামাত্র ব'লে ফেললেন—কি জানি কেন আজকে একটা পারস (ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ) আলাদাভাবে ধরা আছে। মনে হয়, তোমারই জন্য। তুমি বুঝি সকাল থেকে কিছু খাওনি? মুখ দেখে ত সেই রকমই মনে হ'চ্ছে।

বাবাজী মহারাজ এবার তাঁর সঙ্কল্পের কথা বিহারীদার কাছে

জানালেন। বিহারীদার ধারণা হল, এ পারস তাঁরই জন্য ঠাকুরের ইচ্ছায় ঠিক করা আছে। নানাভাবে অনুরোধ ও উপরোধ ক'রে তাঁকে প্রসাদ পাওয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে এই বলে আশ্বস্ত ক'রলেন —শ্রীগুরুদেব নিশ্চয় তোমার জন্য কিছু ব্যবস্থা ক'রছেন। তুমি কোন চিন্তা করো না।

ইতিমধ্যে কুমুদিনী দাসী বড়বাবাজীর কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন—'পুরীর হরিদাস ঠাকুরের মঠর ক্ষার জন্য রাম চেষ্টা ক'রছে! তুমি তোমার রামদাদাকে ডেকে মঠ রক্ষার ব্যবস্থা কর।' কিন্তু তিনি তো রামদাদাকে চেনেন না, রামদাদাও তাঁকে চেনেন না। কুমুদিনী দাসী বড় চিন্তায় প'ড়লেন।

এমন সময় কানে এল, রাস্তা দিয়ে কে একজন ভক্ত মধুরকণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম করতালে বাজিয়ে গেয়ে যাচ্ছেন। মনে কি রকম একটা ধারণা হ'ল, ইনি বোধ হয় সেই রামদাদাই হবেন। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী নারী, কি করে এঁর পরিচয় নেবেন! এক পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিলেন বৈষ্ণবের অনুগমন ক'রে জেনে আসবার জন্য, উনি কোথায় থাকেন।

পরদিবস তিনি জানলেন—তিনিই সেই রামদাদা। সঙ্গে সঙ্গে রামদাদাকে বাড়ীতে কীর্ত্তন করার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। সে সূত্রেই স্বপ্নাদেশের কথাও কুমুদিনীদাসী বাবাজী মহারাজের কাছে জানালেন। তারপর রথযাত্রার সময় পুরীতে উপস্থিত হ'য়ে প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে বাবাজী মহারাজের নামে হরিদাস ঠাকুরের মঠটি রেজষ্ট্রী ক'রে দেওয়া হ'ল। এই হচ্ছে মঠ

উদ্ধারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। আজ এই মঠ নিষ্ঠা ও সেবার দিক থেকে এক আদর্শতম আশ্রমে পরিণত হ'য়েছে। এখানে সেবার সুব্যবস্থার জন্য বাবাজী মহারাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সকলকে মুগ্ধ ক'রত। হরিদাসের সমাধি-মন্দিরপ্রসঙ্গ উঠলেই বাবাজীমহারাজের কথা স্মরণ হয়। এইভাবে এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ কত বৈষ্ণবতীর্থকে যে অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা ক'রেছেন, নব নব মহিমায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

অদ্যাপিহ সেই লীলা—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—

এই মহাজনবাক্যটি এ দেশের ভক্তসমাজের শিরোধার্য্য। আমরা এখন বাস্তববাদী জগতে বাস করি, তার প্রভাবমুক্ত হওয়া সহজ নয়। অতীন্দ্রিয় লোকের খানিকটা ধরা দেয় আমাদের বোধে, খানিকটা থাকে অজানা। মহাজনবাক্য আমাদের মনে ছাপ ধরাতে পারে তখনই যখন প্রত্যক্ষ ও কিছুটা অনুরূপ লীলার প্রকাশ আমাদের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। সেইরূপ একটি লীলাকাহিনীই বর্ণনা ক'রছি—

একবার শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বগণসহ চ'লেছেন কোন ভক্তের আমন্ত্রণে বর্ত্তমান মানভূমের অন্তর্গত কুমারধুবি গ্রামে। সঙ্গে রয়েছে তাঁর বহুতর অনুগত ভক্ত। ষ্টেশনে নেমেই চোখে প'ড়ল অশ্বিনীবাবুর 'হিতৈষী' পত্রিকা। এতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে একজন নির্য্যাতিত হরিনাম-পাগল মুসলমানের বিস্ময়কর কাহিনী।

ভক্ত চারুচন্দ্র বোস ম'শায় এই পত্রিকাটির প্রতি বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। ঘটনাটির বিবরণে জানা গেল যে, বরিশালের কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান নিরন্তর হরিনাম করেন। তাঁর আত্মীয়-পরিজন তাঁর এই স্বভাবের প্রতিকারের

জন্য বহু চেষ্টা ক'রেও বিফল হ'য়েছেন। এবার আরম্ভ হ'য়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচার, অকথ্য গালিগালাজ ও নির্ম্মম প্রহার। প্রায় প্রাণ সংশয়ের অবস্থা। পীড়নের আতিশয্যে এ ভক্তের চক্ষু দুইটি অন্ধত্ব প্রাপ্তির পথে। দেশ বিশ্রুত রাজনৈতিক নেতা, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এই ভক্তপ্রবরের জন্য ব্যথিত হয়ে জন-সমক্ষে এ সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। এ সংবাদে বাবাজী মহারাজের প্রাণতন্ত্রী স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌লো, সর্ব্ব অন্তর কেঁদে উঠ্‌লো।

অশ্বিনীবাবু বাবাজী মহারাজের বিশেষ গুণগ্রাহী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর বৈরাগ্য-জীবনের ত্যাগপূত ও মাধুর্য্যময় ইতিহাসটুকুর সঙ্গে পরিচিত। দুই মানব প্রেমিকই এ ব্যাপারে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন।

বাবাজীমহারাজের প্রাণ কাঁদ্‌ছিল এ মুসলমান ভক্তের জন্য। তাঁর উপর সমান ভাবেই উৎপীড়ন চ'লছে। বাবাজী মহারাজ প্রাণে প্রাণে তাঁর ইষ্ট দেবতার কাছে এই ভক্তটির কল্যাণ প্রার্থনা ক'রছেন। অশ্বিনীবাবু ভাবলেন, এই ব্যক্তি যদি এভাবে দিনের পর দিন নির্য্যাতিত হ'তে থাকেন তবে শেষ পরিণাম অবশ্যই মৃত্যু। অনেক চিন্তা ক'রে দেখলেন, এঁকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। যবনকুলে জন্ম, তাঁকে কে স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, প্রেম-আহ্বানে ডেকে নেবে?

অশ্বিনীকুমারের মানস নয়নে ভেসে উঠল শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা। যাঁর বাল্য কৈশোর কেটেছে পতিত পাষণ্ডের মধ্যে তাদের আপন জন হ'য়ে। তাদের সমাজের কোণঠাসা নিষ্ঠুর

অত্যাচারের হাত থেকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে তিনি হরিনাম সুধা পান করিয়েছেন, তাদের উন্নয়নের পথে নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছেন। অশ্বিনীবাবু ঠিক ক'রলেন, এই মুসলমান ভক্তটির প্রাণ প্রবাহকে শ্রীল রামদাসজীর উত্তাল নাম তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। হরিনাম সুধাসিন্ধুতে তাঁর অবগাহনের সুযোগ করে দেবেন। এদিকে উৎকণ্ঠিতহৃদয় বাবাজী মহারাজ এই ভক্তের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় দিন গুণছেন।

অশ্বিনীবাবুর ইঙ্গিত অনুযায়ী এই হরিনাম-পাগল হুসেন আলী এসে হাজির হ'লেন নবদ্বীপের সমাজবাড়ীতে। অনুসন্ধান নিয়ে জানলেন বাবাজী মহারাজ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের উৎসবে শ্রীখণ্ডে গেছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র তিনিও রওনা দিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শীত। পরিধানে একটি মাত্র চটের বহির্ব্বাস। কপর্দ্দকশূন্য মহাবৈরাগী চ'লেছেন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠার প্রবল জোয়ারে ভেসে ভেসে। উৎসবস্থান একটি দিগন্ত-ব্যাপী মাঠ—নাম বড়ডাঙ্গা। অগণিত ভক্ত, সাধুসন্ত ও দর্শনার্থীর সমাবেশ সেখানে।

প্রথমে তিনি চিন্তা ক'রলেন, এই বিরাট ভক্তসঙ্গমে কেমন ক'রে বাবাজীর সন্ধান পাব? তাঁকে আমি আগে কখনো দেখিনি যে চিনবো। এমন সময় নজরে প'ড়লো এক অশ্রুকম্পময় ও পুলকাঞ্চিত, নামগানে প্রমত্ত শ্যাম-উজ্জ্বল মহাপুরুষ। প্রাণে সাড়া পেলেন, ইনি নিশ্চয় তাঁরই অভীপ্সিত পুরুষবর। চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালেন। ভাবের শিহরণ উভয়ের অঙ্গে ফুটে উঠল। রামদাস বাবাজী মহারাজ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে নিজের

কাছে রাখলেন, পরে নবদ্বীপে এনে দীক্ষামন্ত্রদানে তাঁকে বিশুদ্ধ ভজনপথের অধিকারী ক'রে তুললেন।

তারপর এই জীবনটিতে প্রেমমন্দাকিনী বইতে আরম্ভ হ'ল উচ্ছ্বলিত তরঙ্গে। সে তরঙ্গ আবার কত কত ঊষর হৃদয়ে এনে দিল ভক্তি ও প্রেমের ধারা। এঁর জীবনধারার রূপটি দেখলে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কথাই স্মরণ হয়। এ স্মরণকে উদ্দীপিত করে এঁর নাম, এ ভক্তের নাম শ্রীহরিদাস বাবাজী। শুনেছি শ্রীল বাবাজী মহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শ্রীল গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ এঁকে সন্ন্যাস দান ক'রে এই নামকরণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাবাজী মহারাজ সন্ন্যাস বা ভেক কখনো কাকেও দিতেন না।

নবদীক্ষিত এই হরিদাসের জীবন অপূর্ব্ব। সর্ব্বদা মালাজপ ক'রছেন। মুহূর্ত্ত বিরাম নেই। ভজন আবেশে দেহাত্মবোধ নেই। বার্দ্ধক্যে অঙ্গ অপটু হ'য়েছে। উৎপীড়নের ফলে আগে থেকেই চক্ষু দুটী প্রায় অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁকে নিত্য সকালে দর্শন দিয়ে আসেন। দেখা দিতে আসেন কি দেখতে আসেন বুঝি না। তবে দেখা দিতে আসা বা দেখতে আসা, যাই হোক না কেন, এর মধ্যে একটা আন্তরিক প্রাণের স্পর্শ জেগে উঠ্‌তো।

একদিন বরানগরস্থ পাঠবাড়ীতে আমরা কয়েকজন অতি প্রত্যূষেই উপস্থিত। সে সময় বাবাজী মহারাজ ঠাকুর দেবতার প্রণামবন্দনা সেরে তুলসী প্রদক্ষিণ ক'রছেন। সঙ্গে কয়েকজন

বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত রয়েছেন। আমরাও সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

তুলসী প্রদক্ষিণ সেরে বাবাজী মহারাজ চ'লেছেন অনতিদূরে দক্ষিণদিকস্থ বৈষ্ণবখণ্ডে। এখানে আশ্রমের সাধুসন্তের বিশ্রামের স্থান। বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবখণ্ডের বারান্দায় এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন যেন কার অপেক্ষায়। তারপর হরিবোল ধ্বনি দিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠের প্রেম-আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল ওই "হরিবোল", নিকটস্থ আর একটি বৃদ্ধের মধুর ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে।

আমরা উৎকর্ণ হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রছি। কে সেই মহাভাগ্যবান, তাঁকে দেখবার জন্য। পরক্ষণেই দেখি এক সেবক একটি দীনবেশ কাঙ্গাল বৈষ্ণবকে হাতে ধ'রে নিয়ে আসছেন বাবাজী মহারাজের দিকে। বৃদ্ধটীর চক্ষুদুটী অন্ধ। কিন্তু কি এক দিব্যচক্ষে চক্ষুষ্মান, যার জন্য তাঁর বদনমণ্ডল থেকে ঝরে প'ড়ছে ভজনস্নিগ্ধ লাবণ্যের ছটা, মুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির হাসি।

এদিকে বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখেও ফুটে উঠেছে এক আনন্দের দীপ্তি। তাঁর চক্ষের তারাদুটি যেন জ্বলে উঠেছিল এঁকেই দেখবার জন্য। বৃদ্ধটি কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রলেন বাবাজী মহারাজের চরণে। এ বৃদ্ধ আর কেউ নন, ইনি হচ্ছেন আত্মসমর্পিতপ্রাণ বরিশালের সেই ভক্ত হরিদাস। বাবাজী মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তার শারীরিক কুশল বার্ত্তা। গুরু শিষ্যে কত স্বাভাবিক সম্বন্ধের বিকাশ। কেউই ব্যস্ত নয়

ব্যবহারের পারিপাট্যের জন্য। যোগাযোগ তাঁদের অন্তরের। তাই তাঁদের ভালবাসা রয়েছে অন্তরে ওতপ্রোত।

বাবাজী মহারাজের প্রশ্নে হরিদাস তাঁর সব কিছু সুবিধা অসুবিধা ঠিক একটি সরল শিশুর মত জানালেন। বাবাজী মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যথাবিহিত ব্যবস্থা বন্দোবস্তও ক'রে দিলেন। তারপর বৈষ্ণবখণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রণাম বন্দনা সারলেন একটি মাধুর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে।

বাবাজী মহারাজ ফিরে আসছেন তাঁর ভজন কুটীরের দিকে, পথে একটি ভক্তের কাছে খুব উল্লসিত হ'য়ে প্রশংসা ক'রলেন ওই বৃদ্ধটির। সেই কথার ফাঁকে বৃদ্ধটির অপরূপ জীবন কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

বাবাজী মহারাজের স্বভাব ছিল খুব অল্প কথা বলা। কথা কইবার ভঙ্গীটিও অতি মৃদু ও মধুর। যাঁকে ব'লছেন সে ছাড়া অন্যের অনেক সন্তর্পণে না শুন্‌লে বোধগম্য হওয়া কঠিন। সে সময় যা শুনতে পেয়েছিলাম তারই কিছু জানিয়ে প্রবন্ধটীতে ছেদ টানব। বলেছিলেন, "এসব কথা বাইরে প্রচার ক'রবার নয়। কাউকে বলাও ভাল নয়। শুধু শুনে রাখ। বাইরের লোক শুন্‌লে পরে ভীড় জমাবে। তারপর আজকাল কথায় কথায় অবতার। ওসব আমার মোটেই ভাল লাগে না।—সেবার কীর্ত্তন করতে যাওয়া হ'চ্ছিল। ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর হিতৈষী পত্রিকায় এঁর সম্বন্ধে বেরিয়েছে ব'লে শুনলাম। মনে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগল। তারপরই কিন্তু প্রভুর ইঙ্গিতে অশ্বিনীবাবুর সাহায্যে ইনি এখানে এসে প'ড়লেন। অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে আমার

খুব হৃদ্যতা ছিল। তাঁর ভক্তিযোগ আমাকে খুব মুগ্ধ ক'রত।"

তাই মনে পড়ে ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের কথাটি,—অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।—

নবদ্বীপের সমাজবাড়ীতে

সে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। আমি তখন যৌবনে উপনীত হয়েছি। পাঠ্যজীবন ঠিক শেষ হয়নি আবার কর্ম্ম-জীবনও আরম্ভ হয়নি। এই সন্ধিক্ষণে সুযোগ এসে গেল শ্রীধাম নবদ্বীপ যাওয়ার। পিছনে প্রধান আকর্ষণ শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উৎসবে শ্রীল বাবাজী মহা-রাজের অমৃত মধুরকণ্ঠের সূচক কীর্ত্তন শ্রবণ।

১৩৫১ সনের ২৯শে মাঘ রবিবার বেরিয়ে পড়ি শ্রীধাম নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে। মনে আনন্দের ছোঁয়া লাগছে কত অভিনব ছন্দে। কল্পনার জোয়ার এসে হৃদয় তটভূমিতে বিছিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভাবরাজ্যের নূতন নূতন মণি মানিক। তন্দ্রাতুর অবস্থায় চলেছি ট্রেণে। কত ষ্টেশনে এসে গাড়ী থেমেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। কল্পনার বান আমায় ডুবিয়ে দিয়েছে কানায় কানায়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সমাগমে পশ্চিম দিগন্ত রাঙ্গিয়ে উঠল আর ট্রেণ সশব্দে জানিয়ে দিল শ্রীধাম নবদ্বীপ পৌঁছানোর বার্ত্তা।

নামলাম ষ্টেশনে। সবই যেন নূতন, নূতনের নেশায় মন মশগুল। ষ্টেশনে রিক্সাওয়ালারা যাত্রীদের ডাকছে—বাবু "সমাজ-বাড়ী" যাবেন ?

আমরা সোৎসাহে চেপে বসলাম একটা রিক্সায়। নবদ্বীপের আকাশ, বাতাস, পথঘাট দেখতে দেখতে চলেছি আর ভাবছি এই

সেই পুণ্যভূমি যেখানে নদীয়ার সোনার গৌর নেচে, গেয়ে, কেঁদে গেছেন। চেতনার পর্দ্দায় গৌরের নদীয়া-বিহার ভেসে উঠছে কত না অভিনব বৈচিত্র্যে। বিহ্বল অবস্থায় চলেছি। ইতিমধ্যে একটু বাহ্যস্মৃতি আসতেই দেখি বহুবাজারে এসে পৌঁছেছি। আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁদিকে একটি মন্দির—নাম 'সোনার গৌরাঙ্গবাড়ী'। ডানদিকে বিদ্যাসাগর কলেজের বোর্ডিং। ক্রমে গঙ্গার ধারের দিকে আর একটু এগোতেই বাঁদিকে শ্রীবাস অঙ্গন, আর ডানদিকে আমাদের গন্তব্যস্থল শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজের লীলাস্থলী "সমাজবাড়ী"।

দূর থেকে গুরুগম্ভীর খোল করতালের ছন্দে ছন্দে শত শত ভক্তকণ্ঠের অবিরত কীর্ত্তন ধ্বনি উঠছে—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"।

নামগান ও উৎসবমুখরতা সমাজবাড়ীর পরিচয় বহন করছে। যে মহাপুরুষের উৎসব, তিনি যে নামের পাগল। নামকে বাদ দিয়ে ত তাঁর উৎসব হয় না! তাই যেন আজ শ্রীনাম তার স্বীয় মহিমায় আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে তার ভাবাবেশ ও পাগলামির বার্ত্তা বয়ে।

চারিদিকে চেয়ে দেখি কত দূরদেশ থেকে সাধু-সজ্জন, গৃহস্থ ও ভক্তের সমাগম হয়েছে। প্রাণের ভিতর যেন এক অস্থির আনন্দ শিহরণ চলেছে—কতক্ষণে আমি হৃদয়, নয়ন ও মন ভরে আকাঙ্ক্ষিত উৎসবের সব সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ করব।

সমাজবাড়ীতে প্রবেশ করার পরই হৃদয় ভরে উঠল গভীর শ্রদ্ধায়। নয়ন ভরে উঠল আনন্দে। যখন দেখলাম আজ আমি পৌঁছেছি এমন এক স্থানে যেখানে উৎসবের জাঁকজমক ও সাফল্য নির্ভর করছে নামাস্বাদনের আত্মভোলা পরিবেশে। আশ্রমের প্রতি ধূলিকণার মধ্যে যেন উৎসবের মত্ততা অনুভূত হয়েছিল। সে স্মৃতি ভুলবার নয়।

নাটমন্দিরে চলছে আরতি কীর্ত্তন। এর পর কীর্ত্তনে বসবেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ। তাই স্থান সংগ্রহের ব্যস্ততা পড়ে গেছে সমবেত জনতার মধ্যে। রাত্রি কাটানোর জন্য বাসস্থানের চিন্তা রইলো পড়ে। ঢুকে পড়লাম নাটমন্দিরে।

বাবাজী মহারাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রাখা আসনের কাছাকাছিই জায়গা করে নিলাম। ঠিক মধ্যস্থলে নবরাত্রব্যাপী অখণ্ড নামযজ্ঞের বেদী। আজ নামযজ্ঞের সপ্তম দিবস। প্রতিদিন আরতির পর বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে বসেন। এক একদিন এক একটি বিষয় নিয়ে কীর্ত্তন করেন। সমবেত জনতার একমাত্র লক্ষ্য অন্ততঃ এই সময়ে উপস্থিত হয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন উপভোগ করা।

আরতি অন্তে সকলেই বাবাজী মহারাজের আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বাদে এই প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে বাবাজী মহারাজের আগমন নবচেতনার সঞ্চার করল। সমগ্র জনতা হরিধ্বনিপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হলেন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তির মধ্যে যেন আজ এক

অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে। পরনে দীন-কাঙ্গাল বেশ। নয়নে প্রবল অনুরাগের ঢেউ উপ্‌ছে পড়ছে। গণ্ডস্থলে যেন আবিরের ছোঁয়া লেগেছে। শ্রীমুখমণ্ডলে বিরহোচ্ছ্বাসের ছাপটী ফুটে উঠেছে। যজ্ঞ-বেদীর দিকে পূর্ব্বমুখ ক'রে আসন গ্রহণ ক'রলেন। প্রথমে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালেন, পরে বহুক্ষণ প্রণামবন্দনা ক'রলেন নিজ অভীষ্টদেবের প্রতি। আসর নিস্তব্ধ, কেবল নাম ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নাই। এবার ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে কীর্ত্তন ধরলেন—

শান্তিপুরের বুড়ামালি
বৈকুণ্ঠ বাগান খালি
(খালি) করিয়া আনিল এক চারারে।
নিতাই মালিরে পাইয়া
চারা তার হাতে দিয়া
যতনে রোপিতে কৈল নাড়ারে॥

পদকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদাসের বহু প্রাচীন এই মহামূল্য পদটী পুঁথিতেই নিবদ্ধ। একরকম অখ্যাতভাবেই আত্মগোপন ক'রে ছিল। আজ সুরের মধু সিঞ্চনে শত সহস্র ভক্তের কর্ণে তা অনুরণিত হ'ল ভোগমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে। এক একটি পদের এক একটি চরণ গাইছেন আর তার মর্ম্মার্থ বিস্তার ক'রছেন আখরে আখরে। কবির অদ্ভুত বর্ণনাভঙ্গির যে চাতুরী তা আজ বাবাজী মহারাজের নিপুণ পরিবেশনে সমবেত জনতার হৃদয়ঙ্গম হ'ল। শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বৈকুণ্ঠের বাগান থেকে শ্রীচৈতন্যরূপী একটি প্রেমচারা এনেছেন। প্রকৃষ্ট বাগানের উপ-

যোগী স্থান নির্ব্বাচিত হল নদীয়া। তাতে আবার সুদক্ষ মালী নিতাইচাঁদের উপর ভার পড়ল চারাটী রোপণের। এভাবে কবির বর্ণনাটি বাবাজী মহারাজের আখরে আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

এই ধর নাও নিতাই মালী
যতনে রোপণ কোরো।
আমার বড় সাধের শ্রীচৈতন্যতরু
যতনে রোপণ কোরো!
যতনে রোপিতে কৈল নাড়ারে॥
(আমরি) নদীয়া উত্তম স্থান
তাহাতে করি উদ্যান।
(অভিন্ন ব্রজমণ্ডল)
(শ্রীনবদ্বীপ রম্যস্থল অভিন্ন ব্রজমণ্ডল)
(সেই) নদীয়া উত্তম স্থান
তাহাতে করি উদ্যান।
তাতে রোপিল চৈতন্যতরু মালী রে।
যতনে রোপণ কৈল।
আমার গুণনিধি নিতাই মালী
যতনে রোপণ কৈল।
সীতানাথের আনা শ্রীচৈতন্যতরু
যতনে রোপণ কৈল
নদীয়া উদ্যানে রোপণ কৈল।

বাড়ে তরু দিনে দিনে
শাখাপত্র অগণনে
গজাইল যতনে জল ঢালিরে ॥
পাইয়া ভকতি জল
নামপ্রেম দুটি ফল
প্রসবিল সে তরু সুন্দর রে।
সেই দুই ফলের আশে
জীব পাখী নিত্য আসে
(তারা) কোলাহল করে নিরন্তরে ॥
আমার গুণনিধি নিতাই মালী
তাহাতে ভরিয়া ডালি
দুই ফল সবারে বিলাই রে।
যে চায় সে পায়
যে না চায় সেও পায়
যবনেও ফল আস্বাদিল রে ॥
কি মোর করম ফেরে
না হেরিলাম সে তরুরে
না চিনিলাম সে মালী দয়াল রে।
কৃষ্ণদাস দুরাশয় দন্তে তৃণ ধরি কয়
ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল রে।

সমগ্র জনতা অদ্ভুত আনন্দ স্পর্শে স্বপ্নাতুর। কত অভিনব ছন্দে আখরে আখরে কীর্ত্তনের মাধুর্য্য নব নব উল্লাসে পরিবেশিত হচ্ছে। কীর্ত্তনের মাঝে মাঝে অক্রোধ পরমানন্দ ক্ষমাসুন্দর প্রভু

নিত্যানন্দের গুণব্যাখ্যানে নব নব আখর প্রকাশ পাচ্ছে। বাবাজী মহারাজের ভাবাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। সে সময় চলছে মাতন। যাকে বলে ভাবরসের মাতামাতি।

রাত্রি দশটা নাগাদ বাবাজী মহারাজ আসন ছেড়ে উঠলেন যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণের জন্য। সমগ্র জনতা সমেত যজ্ঞবেদী ঘিরে ঘিরে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" নাম গান কচ্ছেন।

এবার আরম্ভ হ'ল তাঁর অপরূপ উদ্দণ্ড নর্ত্তন। বাবাজী মহারাজ নিজেই এই নর্ত্তনের সূচনা করলেন। তারপর জনতার প্রতি হানলেন সর্ব্বমনোরঞ্জন কটাক্ষ। যার দিকে চেয়ে দেখেন সেই মেতে উঠে। তার হৃদয়ের তন্ত্রী খোল করতালের তালে তালে নেচে উঠে। যাতুকরের কাঠির পরশে তার হৃদয়ের চিররুদ্ধ দ্বার হঠাৎ যেন খুলে যায়। দেহে থাকে না দেহাত্মবোধ, মনে আসে না জড়তা। ক্লান্ত অবসাদ সব সরে গিয়ে সে কেবল কাঠের পুতুলের মত নাচতে থাকে কোন অদৃশ্য শক্তির প্রেম স্পর্শে। তার নিজস্ব বোধ ঘুচে যায়। কে যেন তাকে নাচাচ্ছে তাই নাচ্ছে। তিনি যতক্ষণ না থামানোর ইচ্ছা ক'রছেন কারুর সাধ্য নাই যে তাঁকে থামায়। নামের দেবতা নাম সভায় না নেমে এলে কি এটা সম্ভব হয়? ভক্তের ভক্তি ডোরে ভগবান যে চিরবদ্ধ।

বাবাজী মহারাজের প্রেম কণ্ঠের আর্ত্তিতে জনতার হৃদয় মথিত ক'রে প্রেমাশ্রু নির্গত হ'ল আর মেতে উঠল প্রেমমাতঙ্গ নিতাই চাঁদের গৌর প্রেমে আপনি মেতে জগত মাতান মাতালিয়া নৃত্যচ্ছন্দে।

রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বাবাজী মহারাজ বেদীস্থান ত্যাগ ক'রে অনতিদূরে নিজ ভজন কুটীরে গেলেন। কিন্তু রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত চ'লল সে নৃত্যের বিরামহীন গতিবেগ। কেউ কেউ মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ। আমিও তাদের সঙ্গে মেতে উঠেছি নিজের অজ্ঞাতে। কতক্ষণ মেতে ছিলাম বা কি কি করেছি কোন স্মৃতিই নাই। যখন কীর্ত্তনস্থান ত্যাগ ক'রলাম তখন ১টা বেজে গেছে। ইতিমধ্যে আমার মাসীমা সমাজবাড়ীর পাশেই একটা আস্তানা ঠিক ক'রেছেন। আশ্রমে প্রসাদ পেয়ে নিয়ে তাঁর আশ্রয়ে চ'লে এলাম। রাত্রিটা কাটল আনন্দে ও একরকম স্বপ্নাতুর অবস্থায়।

পরদিন সোমবার শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের অষ্টম দিবস। ভোর চারটায় আশ্রমে মঙ্গল আরত্রিকের শব্দ পেলাম। আশ্রমে এসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে মহারাজের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন হ'ল। সকাল থেকে আশ্রমের সর্ব্বত্রই যেন একটা সাজ সাজ ভাব। কারণ আজ শ্রীচরণদাস বাবাজী মহারাজের (বড় বাবাজী মহারাজের) মহাভিষেক স্নান।

বড় বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তির সম্মুখের বারাণ্ডায় রূপা ও পিতলের ১০৮টী কলসী সারিবদ্ধভাবে রাখা হ'য়েছে। এই কলসীগুলি সমবেত জনতার মধ্যে যাদের সামনে পাওয়া যাবে তাদেরই দেওয়া হবে গঙ্গাবারি আনয়নের জন্য। তারাই হবে সৌভাগ্যবান!

অসংখ্য লোক। অথচ মোটে ১০৮টী কলসী। যাদের ভাগ্যে জুটবে না তাদের জন্য সমাজ-বাড়ীর সামনেই কুম্ভকার ব'সে

বেচছে কলসী। তারা মাটির কলসী কিনে সেই দলভুক্ত হ'চ্ছে। ক্রমে একটি বিরাট কীর্ত্তনযূথ গঙ্গার দিকে রওনা দিলেন।

একদল ভক্ত কীর্ত্তনসহ অনতিদূরবর্ত্তী ভজনকুটীর থেকে সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের (বড় বাবাজী মহারাজের পরম গুরু) স্নানবারি নিয়ে ফিরলেন। তারাও আবার এই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সকলেরই মস্তকে এক একটি কলসী। কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ ক'রেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মস্তকে কলসী আর মুখে "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম বসন্তরাগিনীতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে গীত হ'চ্ছে।

শ্রীবাসঅঙ্গনঘাট অতিক্রম ক'রে গঙ্গায় যেতে গেলে প্রায় মিনিট পাঁচেকের মত সময়ের পথ চড়া আছে। একে শ্রীবাস-অঙ্গনঘাট চড়া বলে। ভক্তবৃন্দ এই চড়ার পথ ধ'রে চ'লেছেন গঙ্গার দিকে নৃত্যোচ্ছ্বল কীর্ত্তনরঙ্গের ছন্দে ছন্দে। ক্রমে গঙ্গায় পৌঁছে সকলেই সারিবদ্ধ হ'য়ে ব'সে গেলেন কলসী মার্জ্জনে। মুখে চলছে নাম আর আনুষঙ্গিক কাজ চ'লছে যেন নামেরই তরঙ্গে। আহা মরি বলিহারী অপরূপের হাটে কি অপরূপই না তোমার লীলা।

এবার সারি সারি ভক্তবৃন্দ তাঁদের পরিপূর্ণ গঙ্গাবারি কলস মস্তকে, খোল করতালের নৃত্যগীত ছন্দে অগ্রসর হ'লেন সমাজ বাড়ীর দিকে। তাঁদের সমগ্র সত্তায় যেন আনন্দের দুয়ার খুলে গেছে। বহির্জ্জগতের পরিবেশ তাঁরা ভুলে গেছেন। আনন্দের প্রেমাবগাহনে তাঁদের হৃদয়তন্ত্রী নেচে উঠেছে। নয়নে

অনুরাগের দিব্য জ্যোতি। তাই আজ অনুরাগোত্থিত প্রেমগাথা গীত হ'চ্ছে কত না রঙ্গে।

সমাজবাড়ীতে পৌঁছে কলসীগুলি নীত হ'ল চরণদাসজীর মন্দিরের সম্মুখে। সমাজবাড়ীর প্রবেশ পথ উত্তরমুখো। আশ্রমে প্রবেশ করেই ঠাকুরদের মন্দির দক্ষিণমুখো। সামনে নাটমন্দির, তারপর বড় বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির। সবশেষে বড়-বাবাজী মহারাজের গুরুদেব শ্রীল গৌরহরিদাস মহান্তের সমাজ।

আশ্রম প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। বেলা ১০টা নাগাদ বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দ চরণদাসজীর অষ্টধাতুময় শ্রীমূর্ত্তিতে তৈল হরিদ্রা লেপন ক'রলেন। পরে সমবেত ভক্তবৃন্দের আনীত গঙ্গাবারি দ্বারা চরণদাসজীর মহাভিষেক স্নান হ'ল। ঘন ঘন হরিধ্বনি ও নারীকণ্ঠের উলুধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠল সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণ। এই মহাভিষেক বারি ভক্তবৃন্দ সযত্নে রক্ষা করেন। তাঁরা এই বারি বহু দূর দূরান্তে নিয়ে যান। শুনা যায়, এই স্নান-বারিতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হ'য়েছে।

বেলা ১২টায় চরণদাসজীর মূর্ত্তিকে মনোরম সাজে দর্শন করলাম। তারপর ষোড়শোপচারে ভোগরাগ হ'ল। সব সময়েই আনন্দ মুখর পরিবেশ। আবার সন্ধ্যা এল। আরতি অন্তে বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে বসলেন। আরম্ভ ক'রলেন "শ্রীশ্রীনিতাই মহিমা" কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনে বসে বাবাজী মহারাজ সেই চিন্ময়রূপের সঙ্গে এমনই নিত্যযুক্ত যে বাহ্যজ্ঞান রহিত। অশ্রুজলে গণ্ডস্থল পরিপ্লাবিত। কখন মিনতির মৃদু আহ্বান

আবার কখনও দৃপ্ত অভিমান। বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় নিত্যানন্দের দানের বৈশিষ্ট যে কি তা সেদিন বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনে ধরা প'ড়েছিল অনবদ্য রূপ ধ'রে। কীর্ত্তনে আখর দিলেন—

ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয়রে।
শ্রীসেবা বিগ্রহ নিতাই আমার
ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয়রে।
বিলাসী গৌরাঙ্গ বিলাসের
ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয়রে।
এই কাজ আমার নিতাই চাঁদের
—ভূমি প্রস্তুত হ'লে পরে,
বিলাসী গৌর আসি খেলা করে।
ডাকতে হয় না ব'লতে হয় না
বিলাসী গোরা আসি খেলা করে।
বিলাসী গোরা খুঁজে বেড়ায়,
বিশুদ্ধ চিত্ত আছে কোথায়।
বিলাসী গোরা খুঁজে বেড়ায়।
চাঁদ নিতাই আমার শুদ্ধ স্বর্ণ,
আশ্রয় তত্ত্বের মূল সম্পত্তি,
চাঁদ নিতাই আমার শুদ্ধ স্বর্ণ।
গৌর অনুরাগ-সোহাগায় শোধন করা
চাঁদ নিতাই আমার শুদ্ধ স্বর্ণ।
ধরায় পরশমণির বর্ণ,

যারে তারে পরশ ক'রে

ধরায় পরশমণির বর্ণ।

এভাবে আখরে আখরে নিত্যানন্দ তত্ত্বটি এতই অনবদ্যভাবে ফুটে উঠছে যে সমগ্র জনতা 'আরো শুনি'-র চাহিদায় ভরপুর। আজকে যেমনি দাতা আবার তেমনি গ্রহিতারূপ বড় বড় মহাজনেরও আগমন হয়েছে। নাটমন্দির হুঙ্কারে ও কীর্ত্তনে উদ্বেল হয়ে উঠছে। নিত্যানন্দের রূপ রস লীলা যেন সমবেত জনতার মনে প্রাণে এক দিব্য স্পর্শ এনে দিচ্ছে। এমন সময় আবার কীর্ত্তন চলল—

কে কোথায় শুনেছ ?

সোনা ছুঁলে পরশ হয়

কে কোথায় শুনেছ ?

জগজনে এইত জানে—

লোহা সোনা হয় পরশ পরশনে,

জগজনে এইত জানে।

সেও ত ধাতুর বিচার করে

পরশমণি বলি যারে,

সেও ত ধাতুর বিচার করে

সে ত যারে তারে সোনা করতে নারে !

এ যে বিপরীত গতি রে।

প্রাণ গৌরাঙ্গের প্রেমরাজ্যে

এ যে বিপরীত গতি রে।

এ যে সোনা ছুঁলে পরশ হয়।
নিতাই সোনা পরশ করে
যারে তারে পরশ করে।
পরশিতেও হয় না,
ভাইরে এমনি আমার নিতাই সোনা,
পরশের অপেক্ষা রাখে না।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই,
মুখে বলা বা কাণেতে শুনা
হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই,
বল্লেই হয় বা শুনলেই হয়।
নিতাই নিতাই ব'লতে শুনতে
দুর্ব্বাসনা মালিন্য স্খালিত হ'য়ে
চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে,
অনাদিকালের সঞ্চিত যত,
মনোমালিন্য স্খালিত হ'য়ে
চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়।
(হেলায় শ্রদ্ধায়) নিতাই নিতাই
বলতে শুনতে
চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হ'লে
পরশমণির খনি অমনি হৃদয়ে জাগেরে।
ইত্যাদি ইত্যাদি

মঙ্গলবার শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের নবম দিবস। সন্ধ্যার সময় ৪৮টি সিধা নানা উপচারে সাজান হ'য়েছে। কীর্ত্তনসহ ভক্তবৃন্দ সেগুলি

মস্তকে ধারণ ক'রে গোস্বামীবৃন্দের বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন। সেজন্য আশ্রমের প্রাণস্বরূপা সখীমাতা শ্রীশ্রীললিতা দাসী সিধা-গুলি পর্য্যবেক্ষণ ক'রছেন অতি নিবিষ্টমনে। তিনিই সমাজবাড়ীর সেবা, পূজা ইত্যাদি কার্য্য পরিচালনার একমাত্র অধিকর্ত্রী। তাঁর ইঙ্গিত ভিন্ন কিছু করা চলে না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁকে দিদি বলেন। দিদির কাজ আশ্রমের রান্নাঘর থেকে আরম্ভ ক'রে সেবা, পূজা খুঁটিনাটী সব দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা। আর ভাইটী নিরন্তর দরজা বন্ধ ক'রে ভজন করেন। কচিৎ কখন একবার ক'রে দরজা খুলেন। তখন কুটীর দ্বার ভ'রে উঠে দর্শনার্থীর সমাগমে।

এবার সন্ধ্যারতির পর বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনে বসেছেন। আজ সুরে সুরে নামের মহিমাই উদ্ঘোষিত হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীনামের মহিমা এক অপরূপ ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে সহস্র সহস্র জনতার হৃদয়বীণায়। বাদকের উৎকর্ষতার উপরই নির্ভর করে বীণার সরস পরিবেশন। আজ বাবাজী মহারাজের মত উপযুক্ত পরিবেষ্টার মধুকণ্ঠে শ্রীশ্রীনামের মহিমা কীর্ত্তন চলেছে—

অপরূপ নাম সংকীর্ত্তনের মহিমা—

খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়রে।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়রে।
(আমরি) পুরে ভাই মনস্কাম
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম,
পুরে ভাই মনস্কাম।

স্বভাব জাগায়ে দেয়রে সুখে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণভোগের,

স্বভাব জাগায়ে দেয়রে সুখে।

নামে বুক ভ'রে যায় অভাব মিটায়

স্বভাব জাগায়ে দেয়রে সুখে।

"নাম সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন রে।

চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম রে॥

কৃষ্ণপ্রেমধন প্রেমামৃত আস্বাদনরে।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন রে॥"

এভাবে শ্রীশ্রীনামের মহিমা এমনই আস্বাদনের হ'য়ে পরিবেশিত হ'চ্ছে যে শ্রবণার্থিকুল আত্মহারা। নামের মহিমাটি উদ্গাতার স্বীয় জীবনে শুধু প্রতিবিম্বিত নয়, শ্বাসে প্রশ্বাসে উদ্যাপিত না হ'লে এরূপভাবে ধরা পড়ে না। আমরা দেখেছি, যে কোন লোক যে কোন সমস্যা নিয়ে বাবাজী মহারাজের কাছে হাজির হ'য়েছেন, তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন নাম ক'রবার। এ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। কীর্ত্তন চ'লেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষের দিকে বাবাজী মহারাজের দৈন্যোক্তি পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত ক'রেছিল। কাল প্রাতে নামযজ্ঞের সমাপ্তি হবে। তাই কীর্ত্তনে আখর দিলেন—

কাল নিশি পরভাতে সুখের হাট

ভেঙ্গে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি

পরদিবস ২রা ফাল্গুন বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া। এই তিথিতেই চরণদাসজী তিরোধান করেন। সকাল থেকে আশ্রম প্রাঙ্গণ যেন

থমথম করছে। বেলা ৮॥টা নাগাদ সূচক-কীর্ত্তনে ব'সবেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ। বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ। কুটীরসংলগ্ন বিরাট চত্বরে সূচক-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। সকাল ৭টা থেকে লোক ব'সে আছেন আসন সংগ্রহ ক'রে।

আটটা নাগাদ নামপ্রেমমত্ত মহাবলী বাবাজীমহারাজ কুটীর থেকে বাহির হ'লেন। কোনদিকে লক্ষ্য নাই। ধীর ও মন্থর পদ-বিক্ষেপে আসরে উপস্থিত হ'লেন। যথারীতি প্রণাম বন্দনা ক'রে আসন গ্রহণ ক'রলেন। সমগ্র দর্শনার্থিকুলের একমাত্র লক্ষ্য-স্থল বাবাজী মহারাজ। সকলের দৃষ্টি তাঁতে নিবদ্ধ। বিরাট জনতা তখন মৌন।

এবার বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন ধরলেন। ত'ার শ্রীমুখমণ্ডল আরক্ত। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ, ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ। বাক্য স্ফুরণ হ'চ্ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ কাটল তারপর ছাড়লেন গুরুগম্ভীর আর্ত্তহুঙ্কার। নিস্তব্ধ আসরে সে হুঙ্কার সমবেত জনতার সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে জাগিয়ে দিল ভাবের উদ্বেলতা। প্রতি হৃদয়ে বেজে উঠল বিরহীর বিরহের করুণ সুর। দাতা পরিবেশ সৃষ্টি না ক'রে কোন কিছুই দান করেন না। বাবাজী মহারাজের দুই গণ্ডস্থল বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ছে অশ্রুপ্রবাহ। এবার অস্ফুট ও ধীরকণ্ঠে কীর্ত্তন ধ'রলেন—

জয় রে! জয় রে! জয়!
শ্রীরাধারমণ জয়
প্রেমদাতা রসের সদন।
কি বা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু
প্রেমে দর দর দুনয়ন॥

চরণদাসজী ১২৬০ সালের ২৯শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন আবির্ভূত হন। যৌবন পর্য্যন্ত কাটে সংসারে খাঁটী সংসারী হ'য়ে। তারপর আরম্ভ হ'ল নাটকের আর এক অঙ্ক—"বৈরাগ্য জীবন", যার কাছে তার অতীত জীবনটা যেন সাপের খোলোস ছাড়া। এই বৈরাগ্য জীবনের সুরু থেকে ১৩১১ সালের ২৪শে ফাল্গুন, ইং ৮ই মার্চ্চ ১৯০৫ খৃঃ বুধবার স্বেচ্ছায় তিরোধানলীলা প্রকাশের দিন পর্য্যন্ত তাঁর দিব্য জীবনে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে তারই এক অনবদ্য কাহিনী গীত হ'তে থাকল এক অপরূপ ব্যঞ্জনায়।

ধর্ম্মজগত ও মানবজীবন যে সময় ভ'রে উঠে কুসংস্কারের বিষবাষ্পে সে সময় যে সব মহাত্মার আবির্ভাব ঘটে চরণদাসজী তাঁদেরই অন্যতম। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের কুসংস্কারের খোলসটি খুলে দিয়ে তুলে ধরেন আসল রূপটি। এককথায় রচনা করেন এক মহাবিপ্লব। সে বিপ্লবের তোড়ে ভেসে যায় কুসংস্কারের বেড়াজাল আর গ'ড়ে ওঠে সত্য সনাতনী ধর্ম্মবাণী ও জীবন। জীবের পরম ধন এই নামের মহিমাকে জীবচিত্তে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর স্বভাবকুণ্ঠিত জীবনে ঐশ্বর্য্যকেও সময় সময় প্রকাশ করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ আহ্বানকে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন নামের মহিমা। তার দৃষ্টান্ত দিগনগরের গাছনাচান। নামের প্রভাবে গাছ নাচে, মরা বাঁচে, পাষাণও গলে যায় তা তিনি সাক্ষাতভাবে নিজ জীবনে দেখিয়ে যান এই পৃথিবীর বক্ষে। ধর্ম্মজগতে সত্যই এরকম একজন সত্যদর্শী বিপ্লবী মহা-

সাধক অতি দুর্লভ। তাঁর অমর জীবনের অনন্ত কাহিনী বলে শেষ করা যায় না।

কীর্ত্তনের ছন্দে ছন্দে চরণদাসজীর জীবনলীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বাবাজী মহারাজ বর্ণনা করতে থাকলেন। সে এক অপূর্ব্ব পরিবেশ। সমগ্র জনতার চক্ষু অশ্রুসজল, হৃদয় বিরহবেদনায় ক্লিষ্ট। ক্ষণে ক্ষণে বালকের ন্যায় রোরুদ্যমান। কল্পনার অতীত সে স্মৃতি। এবার বাবাজী মহারাজ সমগ্র জনতাকে সঙ্গে ক'রে হাজির হ'লেন চরণদাসজীর মূর্ত্তির সম্মুখে। আরম্ভ হ'ল কীর্ত্তন—

"একবার দেখা দাও"—আমি বলব কোন গুণে,
যারা তোমায় দেখতে এসেছে, তাদের মুখ চেয়ে ব'লছি,
লক্ষ লক্ষ নরনারী তোমায় দেখতে এসেছে—
একবার তাদের দেখা দাও।
আমায় দেখা দাও ব'লে, বলবার নাই অধিকার
আয় ভাই আয় ব'লে, তেম্নি ক'রে কোলে নাও।
তোমার কথা শুনি নাই ব'লে, তুমি অভিমানে লুকায়েছ,
তোমার কথা শুনি বা নাশুনি লুকাইয়ে দেখছ।
যদি দয়া করাই স্বভাব তোমার, কেমন ক'রে দেখছ
তোমার কথা না শুনে আমাদের সকলের কি দুর্দ্দশা,
একবার চেয়েও কি দেখবে না?

ইত্যাদি ইত্যাদি

শ্রীগুরুদেবের কাছে সকলের হৃদয়ের আবেদন নিবেদন, সুরে সুরে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। চাওয়া আছে চাওয়ার ভাষা নাই, হৃদয়

আছে আবেগ নাই। এভাবে করুণ আবেদন সকলে জানাচ্ছেন কীর্ত্তনের মাধ্যমে।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ কীর্ত্তন সমাপ্তির পর ৬৪ মোহান্তের ভোগরাগ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অতি মনোরম পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ল।

এবার আরম্ভ হ'ল অন্নদান মহাযজ্ঞ। বেলা ২টা নাগাদ সারা আশ্রম প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোক ব'সে গেছেন প্রসাদ পেতে। আজ ধনী দরিদ্রে কোন তারতম্য নাই। উচ্চ নীচে কোন বিভেদ নাই। সকলেই ভেদজ্ঞানবিবর্জ্জিত এমন একটি স্তরে নেমে এসেছেন যেখানকার একমাত্র মর্ম্মবাণী হ'ল প্রেম।

প্রেমই মানুষকে বিশ্বের দুয়ারে চির আপনার করতে সমর্থ। এ প্রেমবিজ্ঞানের মরম কথা উদ্গীত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে। কালে কালে মানুষ সেই কথার মর্ম্মার্থ ও সাক্ষাৎ স্পর্শ পেল চৈতন্যোত্তর সাধক পরম্পরায়। চরণদাসজী নামদান ও অন্নদান মহাযজ্ঞের ভিতর দিয়ে সে বিজ্ঞানের চরম কথাটি এমন-ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন যা অভূতপূর্ব্ব। অন্নদান ক্ষেত্রে যাকে বলে প্রসাদ বিতরণ—সে কার্য্যে চরণদাসজীর মত মহাবদান্য অতি দুর্ল্লভ। তিনি যেভাবে আচণ্ডালে প্রসাদ বিতরণ ক'রেছিলেন তা প্রাকৃত জগতের দিক থেকে বিচার ক'রলে কোন রাজা-রাজড়ার দ্বারাও সম্ভব নয়।

আবার সেই সঙ্গে তিনি মহাপ্রসাদের মহিমাকে প্রচার ক'রলেন তার উপযুক্ত মর্য্যাদায়। আগে মহাপ্রসাদ ব'লতে

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের প্রসাদকেই বুঝাত। একমাত্র এ বস্তুকেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে মর্য্যাদা দিত। তা ছাড়া সর্ব্বত্র প্রসাদের এ মর্য্যাদা ছিল না। চরণদাসজী ব'ললেন—ঠাকুরের অধরামৃত সঞ্চারিত বস্তু মাত্রেই মহাপ্রসাদ পদবাচ্য। তা জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মর্য্যাদার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। যদি তা না হয় তবে বুঝতে হবে আমরা ঠাকুর বা প্রসাদের কোনটাই মানি না।

এর জন্য মহাবৈষ্ণবকে তর্ক ক'রতে হ'য়েছে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে। বিরুদ্ধদল পরাস্ত হ'য়েছেন তবুও তাদের সে ছুৎ মার্গ যায়নি। তখন প্রকাশ ক'রেছেন ঐশ্বর্য্য। তারপর মহা-প্রসাদের মর্য্যাদাবোধকে প্রচার ক'রেছেন বাংলার ঘরে ঘরে। এ দিক থেকেও তিনি ধর্ম্মজগতে গোড়া ধ'রে নাড়া দিয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তাই তাঁর উৎসবে নামদান আর অন্নদান একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবারিত তাঁর দ্বার। যে আসছে সেই প্রসাদ পেয়ে যাচ্ছে। এভাবে এই অন্নদান মহাযজ্ঞ রাত্র ৪টা পর্য্যন্ত চ'লল। অগণিত নরনারীর আনন্দ কোলাহলের মধ্যে রাত্র প্রভাত হ'ল।

নীলাচলের রথযাত্রায়

পুণ্যকীর্ত্তি যেমন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে দীর্ঘদিন ধরে, তেমনই পুণ্য-স্মৃতিও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রাণবন্ত করে রাখে বহুকাল পুণ্য চরিতের অনুধ্যানে। জীবনের পরম সৌভাগ্যোদয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তাঁকে কেন্দ্র করেই কিছু পুণ্য কথা আলোচনা করবো। বাবাজী মহারাজের সান্নিধ্যে থেকে পরম কারুণিক রূপেই বহুদিন তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। শ্রীধাম পুরীতে রথযাত্রার কালে তাঁর সঙ্গলাভের স্মৃতি কথাই প্রথমে খানিকটা বিবৃত করছি।

বহুদিন থেকে আশা ও আকাঙ্ক্ষায় বুক বেঁধেছিলাম যে, যদি কোনদিন রথযাত্রায় পুরীধামে যেতেই হয় তবে যেন বাবাজী মহারাজের সঙ্গে যেতে পারি। কারণ, শুনেছিলাম তীর্থের উদ্দীপনার মধ্যেই তাঁর সঙ্গ হয়ে উঠতো মধুরতম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-অনুস্মৃতিই বাবাজী মহারাজের বিশেষ দান এবং তীর্থ পর্য্যটনের সময় তাঁর দিব্য আনন্দ-লীলা অনেক কিছু পরিবেশন করতো যা সত্যই মানুষের কাছে হতো মহা আকর্ষণীয়। দেখেছি বাবাজী মহারাজের কথনে, কীর্ত্তনে ও আনন্দ আবেশে বিংশ শতাব্দীর কথা ভুলে মানুষ চৈতন্য-যুগে বিচরণ করতে থাকতো।

১৩৫৯ সনের ৬ই আষাঢ় শুক্রবার পুরী এক্সপ্রেস যোগে এই পুণ্যচরিত মহাভাগবতের সঙ্গে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য পুরীধামের রথযাত্রা উৎসবে যোগদান। মনে সেদিন আনন্দ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই।

ট্রেনে অসম্ভব ভীড়, তিল ধারণেরও যেন স্থান নেই। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও ৪।৫টি বগী রিজার্ভ করা হয়েছে। সহযাত্রীগণ তাদের মালপত্র নিয়ে যে যার যায়গায় এসে বসেছেন। বাবাজী মহারাজের জন্য একটি ছোট কামরা ঠিক করা আছে। তাতে তাঁর নিত্যকার সঙ্গী ঠাকুর ও চিত্রপট ইত্যাদি নিয়ে তিনি একটি আসনে পরম উৎফুল্ল অথচ নিঃশব্দভাবে বসে আছেন। কামরার সম্মুখে প্রচণ্ড ভীড়। যাঁদের ভাগ্যে পুরী যাওয়া হল না তাঁরা বাবাজী মহারাজকে মাসাবধি দেখতে পাবেন না, সেজন্য ব্যাকুল আগ্রহে ষ্টেশনে দর্শন করতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। বাবাজী মহারাজ এবার কামরার দরজাটি খুলে বাইরে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে করযোড়ে করুণাপূর্ণনয়নে দাঁড়ালেন। গাড়ী ধীরে ধীরে এগোতে আরম্ভ হ'ল আর প্লাটফরমের সমবেত ভক্তকণ্ঠে ঘন ঘন "নিতাই গৌর হরিবোল" রব আকাশ বাতাস মুখরিত ক'রে তুল্‌ল। কত ভক্তের গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে প'ড়ছে। ট্রেন দুর্ব্বার-গতিতে এগিয়ে চ'লল।

এক সাথে এত ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলে কোথাও যাওয়ার সৌভাগ্য শুধু আমার কেন বিশেষ কারও ভাগ্যে বড় একটা হ'য়ে ওঠে না। বেশীর ভাগ যাত্রীর সঙ্গেই আমি পরিচিত। তাদের

সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনার মধ্যে ভগবৎ প্রসঙ্গই চলছে। কেউ কেউ বা মনের সুখে গান জুড়ে দিয়েছেন—

"পথহারা প্রেমের পাগল—
যেতে প্রেমের বৃন্দাবন।
ঐ জগন্নাথ তোদের লাগি
হয়েছে আজ সর্ব্বত্যাগী,
ঘুম ছেড়ে আজ উঠরে জাগি,
দেখরে দ্বারে নারায়ণ।" ইত্যাদি।

ভোরবেলা গাড়ী এসে থামলো খুরদা ষ্টেশনে। সেখানে বাবাজী মহারাজের কামরায় ঠাকুরের মঙ্গল আরত্রিক আরম্ভ হ'ল। শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠলো। ধূপ দীপ জ্বলে উঠলো, আর খোল ও করতালের ছন্দে ছন্দে আরত্রিক কীর্ত্তন ভক্তকণ্ঠে গীত হ'তে থাকলো। বহুলোক জমায়েৎ হ'য়েছে। কেউ আকস্মিকভাবে কেউ বা পূর্ব্ব থেকে সংবাদ পেয়ে। আরত্রিক অন্তে সমবেত জনতার মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হ'ল। পরে ভক্তগণ ক্ষিপ্রগতিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পূর্ব্ব থেকে আনীত লুচি হালুয়া তরকারী ইত্যাদি বাল্যভোগ পেয়ে নিলেন।

পুরী ষ্টেশনে বহু ভক্ত ও বিশিষ্ট নাগরিক বাবাজী মহারাজকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। ঐ একই ট্রেণের যাত্রী ছিলেন শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের শিষ্য শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তিনি শ্রদ্ধাভরে মাল্যভূষিত ক'রলেন। ষ্টেশনেই সে কি উদ্দণ্ড নাম কীর্ত্তন! ঝাঁজপেঠা মঠে উপস্থিত

হ'লে বাবাজী মহারাজ তদীয় গুরুদেব শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর মূর্ত্তির সম্মুখে প্রেম-গদগদ কণ্ঠে কীর্ত্তন ধ'রলেন—

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব !
নিতাই-গৌর প্রেমের পাগল,
পরম করুণ শ্রীগুরুদেব !
আমরা কিছুই তো জানতাম না।
(কে আমি আমাদের কি কর্ত্তব্য)
আমরা কিছুই তো জানতাম না
(মধুর গৌরাঙ্গলীলা)
আমরা কিছুই তো জানতাম না
তুমি নিজগুণে জানাইলে।
সংসার কূপ হ'তে টেনে তুলে,
তুমি নিজগুণে জানাইলে
সঙ্গে করে লয়ে এলে—
এই রথযাত্রায় শ্রীনীলাচলে,
সঙ্গে করে লয়ে এলে— ইত্যাদি।

স্বরচিত আখরে বাবাজী মহারাজের আর্ত্তিপূর্ণ আত্মনিবেদন এক অপূর্ব্ব ভাব রসের সৃষ্টি করেছিল। তারপর যে যার স্নান আহ্নিক আহারাদি সেরে নিয়ে কিছু বিশ্রাম ক'রে নিতে লাগলেন অপরাহ্নে মিলনোৎসব কীর্ত্তনে বেরুনো যাবে এই আশায়। অপরাহ্ন চার ঘটিকায় ঝাঁজপেঠা মঠ থেকে কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়ে বাবাজী মহারাজ "ভক্ত সম্মেলন লীলা" কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। সিংহদ্বারে এক জনসমুদ্র। আগ্রহাকুল

ভক্তবৃন্দ বাবাজী মহারাজের কণ্ঠে গৌড়দেশের ভক্ত সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনোৎসব লীলা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন ধরলেন—

মধুর গৌরাঙ্গ লীলা—
রথযাত্রায় এই নীলাচলে,
(মধুর গৌরাঙ্গ লীলা)।
ভাগ্যবানজনে দেখছে—
(শ্রীগুরু কৃপায়)
যার প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে,
সেই ভাগ্যবান জনে দেখছে।
আজ্ঞা আছে প্রাণগৌরাঙ্গের
শ্রীশান্তিপুর নাথের প্রতি,
(আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের)
গৌড়দেশের ভক্ত সাথে
প্রতিবর্ষে নীলাচলে আসিতে।
আজ্ঞা আছে প্রাণ গৌরাঙ্গের ॥

শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া, সকল ভকত ধাইয়া
চলিলেন নীলাচলপুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য পাশ
(আসি) মিলিলা সকল সহচরে ॥
নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে, মিলিল কৌতুক রঙ্গে
নীলাচল পথে চলি যায়।

অতি উৎকণ্ঠিত মনে হেরিতে গৌরাঙ্গ ধনে
অনুরাগে আকুল হিয়ায় ॥

পথে দেবালয়গণ, করি কত দরশন
(আসি) উত্তরিল আঠারনালাতে ॥
সকল ভকত সাথে নাচি গাহি মন সাথে।
যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥
কীর্ত্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল ;
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
শুনি নীলাচলবাসী, পরম আনন্দে ভাসি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি,
আগুসরি যায় মিলিবারে।

গৌড়দেশের ভক্তদের নিয়ে রথযাত্রায় প্রতি বৎসর নীলাচলে আসবে—এই ছিল শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ওপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ। তাই শচীমায়ের আজ্ঞা নিয়ে শ্রীশান্তিপুরনাথ নীলাচলে এসেছেন। কি জানি কেন শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর নীলাচলে আসা সম্পর্কে নিষেধ রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি আচার্য্য-দেবের সঙ্গে প্রাণ গৌরকে দেখতে এসেছেন। এদিকে পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবী প্রদত্ত ঝালিসম্ভার নিয়ে ভক্তগণ সবাই আঠারনালায় উপস্থিত। দিক্‌মণ্ডল কীর্ত্তনের সুমধুর রোলে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন গম্ভীরায় অর্থাৎ কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ীতে স্বরূপ ও রাম রায় সনে

রসালোচনায় মগ্ন। কীর্ত্তনের কলধ্বনি দূর হতে শুনেই প্রভু বুঝতে পেরেছেন— শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গৌড় দেশের ভক্তসাথে নিশ্চয় নীলাচলে এসেছেন, তাই বাবাজী মহারাজ ভাব গদ গদ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

"চমকি বলে গোরারায়।
বলে শুন স্বরূপ রাম রায়॥

আঠারনালার পথে অপরূপ নামের ধ্বনি শুনা যায়, ঐ ধ্বনি চঞ্চল করল আমায়, আমার গৌড় দেশের ভক্তসাথে, বুঝি আসছেন শান্তিপুরনাথ, নইলে এমন ধ্বনি কেবা করে—

শুনিয়া গৌরাঙ্গহরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি
আগুসরি যায় মিলিবারে

কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে তিনি তাঁর প্রিয় গৌড়দেশের ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হতে ছুটলেন।

এভাবে কীর্ত্তন চলতে থাকলে হঠাৎ বাবাজী মহারাজের কণ্ঠ ভাবরসে জড়িম হয়ে উঠলো আর সুরু হলো অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ-সহ প্রেমাকুল কণ্ঠে আখর—

আমার গৌর রাজ্যের
বিপরীত রীতি,
জগজনে এই ত জানে।
নদনদী ধায় সিন্ধুপানে,
মিলিবারে সিন্ধু সনে,
নদনদী ধায় সিন্ধু পানে।
আজ সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল প্রাণে

মিলিবারে নদনদী সনে।
সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল প্রাণে ॥ } —মাতন
"আগুসরি যায় মিলিবারে,"
অপরূপ সে মিলনরঙ্গ
কারো পদ চলে না—
দূরে পরস্পর দোঁহে হেরি,
কারো পদ চলে না।
না চলে পা না সরে রা
সবারই নয়নে ধারা।
না চলে পা না সরে রা ॥ } —মাতন
অপরূপ সে মিলনরঙ্গ।
একবার ভাই কররে স্মরণ ॥
অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন রে ॥
দোঁহে কাঁদে ধরি মহাপ্রভুর চরণ রে ॥
শ্রীবাসেরে কোলে করি কাঁদেন গৌরাঙ্গ—
কত দুঃখ দিয়েছি ব'লে,
প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ ॥
অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌর সিন্ধু সনে।
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে ॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু উপজিল ঢেউ।
ডুবিল নীলাচলবাসী স্থির নহে কেউ ॥

রসোজ্জ্বল আখরে আখরে মিলনোৎসবটি এমনই বিচিত্রভাবে

পরিবেশিত হ'তে থাকলো যে, শ্রোতারা সেদিন চারশত বৎসরের ব্যবধানটি বিস্মৃত না হয়ে পারেনি।

এভাবে লীলাটি বর্ণিত হ'তে থাকাকালীন গম্ভীরা থেকে এক নবাগত কীর্ত্তনমণ্ডলী বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনে যোগ দিল। এক অপরূপ ভাবের বিকাশ সেখানে হ'ল। তখন বাবাজী মহারাজ আখর দিলেন—

অনুমানে হেন বাসি,
তোমরা হও গম্ভীরাবাসী।
দয়া ক'রে ব'লে দাও
কোথা প্রাণের গোরাশশী।
দয়া ক'রে ব'লে দাও—
ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,
দয়া ক'রে ব'লে দাও।
ল'য়ে চল গম্ভীরাবাসী,
আমরা, দেখব প্রাণের গোরাশশী
ল'য়ে চল গম্ভীরাবাসী

(—মাতন)

এই কীর্ত্তনের ধূয়া ধ'রে বিরাট কীর্ত্তনমণ্ডলীসহ বাবাজী মহারাজ গম্ভীরার দিকে এগিয়ে চললেন। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম যে, বাবাজী মহারাজের অঙ্গকান্তি আজ এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ধারণ ক'রেছে। আর সেই দিব্য প্রভায় চারদিকের ভক্তবৃন্দ এক অননুভূত প্রেমের স্পর্শে আত্মহারা হ'য়ে কীর্ত্তন

ক'রতে ক'রতে গম্ভীরার দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমার মনে হচ্ছিল যেন বাবাজী মহারাজের সর্ব্ব অঙ্গ প্রেম রসের ভারে ভারী হ'য়ে গেছে।

বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনানন্দে এগিয়ে চলেছেন ধীর ও মন্থর পাদবিক্ষেপে। কি মধুর সে নৃত্যভঙ্গী! সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে ভাবের তরঙ্গাবলী সমগ্র জনমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। নীলাচলের দিব্যলীলা যেন প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ অনুভূতি তখন চারিদিকে বিস্তারিত। ক্রমে বাবাজীমহারাজ গম্ভীরাবাটীতে মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে কীর্ত্তন ধরলেন।

প্রভুর দর্শনের জন্য এ আর্ত্তিময় প্রার্থনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রাণবন্ত কীর্ত্তন সকলের মনে আশার আলো ফুটিয়ে তুলছে ঘন তমিস্রা ভেদ ক'রে। উচ্চকিত দর্শনার্থীকুল স্থান কাল পাত্র সব বিস্মৃত না হয়ে পারেনি। এবার বুঝি প্রভুর সাক্ষাৎ মিলবে, এ ক্ষীণ আশা মনে রেখে সবাই মহাপুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে তাকিয়ে আছে। ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে গম্ভীরার গবাক্ষপথে।

স্বরচিত আখরে সমবেত জনতার হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যাকুল নিবেদনকে সুরে সুরে রূপায়িত ক'রে কত না কাকুতি মিনতি মান অভিমান মহাপ্রেমিক নিবেদন করলেন তার ইয়ত্তা নেই।

৮ই আষাঢ়, রবিবার। সকাল থেকে সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। আজ ঝালিসমর্পণ লীলা অনুষ্ঠিত হবে। বৈকাল ৫টা

নাগাদ ঝালির দ্রব্যসম্ভার ভারে ভারে ভক্তেরা সারিবদ্ধভাবে মস্তকে ধারণ ক'রে আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হয়ে নিজ নিজ সৌভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রছে। মঠবাড়ীতে শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের সম্মুখে বাবাজী মহারাজ গাইতে সুরু করলেন ঃ—

আজু হবে শ্রীরাঘবের ঝালি সমর্পণ।
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ॥
আজ কার সঙ্গে যাব মোরা!
প্রাণ গৌরলীলা গাইতে গাইতে,
আজ কার সঙ্গে যাব মোরা!
(রাঘবের) অনুরাগের কথা কইতে কইতে
আজ কার সঙ্গে যাব মোরা!

আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে,
আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল—
এস প্রাণের রাধারমণ।
আজ শক্তি সঞ্চার কর,
বাহু পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে
আজ শকতি সঞ্চার কর।

আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু,
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে।

আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু
ভাবাবেশে গাও তুমি,
সঙ্গে সঙ্গে গাই মোরা
ভাবাবেশে গাও তুমি—

বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্য যে, যখন যেখানে যে লীলার যে অনুষ্ঠানই হোক না কেন স্বরচিত আখরে স্বর্গীয় সুরমাধুর্য্যে এমনই নিপুণতার সঙ্গে সেগুলি পরিবেশন করেন যে, ভক্ত মানুষ লীলার বিষয়বস্তুর-আস্বাদনের মাধুর্য্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। লীলাবৈচিত্র্যের পরম মাধুর্য্যে অতি পাষণ্ডও দরবিগলিত-ধারে অশ্রুবর্ষণ করে। প্রতিটী লীলার স্মারক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক গীতি ভাষার ছন্দে ছন্দে সুরের প্রেমতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। শ্রীগুরুদেবের চরণে তাঁর আর্ত্তি ও আত্মনিবেদন বিষয়চঞ্চল মনুষ্য-হৃদয়েও শরণাগতির অনুক্রম ও পথনির্দ্দেশ করে। এই আত্ম-নিবেদনই যে সাধকের পরম পাথেয়, তা তিনি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দেখিয়ে গেছেন। এবার সুরের স্পর্শে শ্রীগুরুদেবকে আহ্বান, শক্তি প্রার্থনা ও পরে গুরু আনুগত্যে লীলানুষ্ঠানের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন—

দময়ন্তী দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া।
নীলাচলে আইল রাঘব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

প্রেমবিহ্বল বাবাজী মহারাজ নয়নজলে ভেসে ভেসে করুণ-মধুর আখর দিতে লাগলেন—

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে—
দময়ন্তী দত্ত দ্রব্যের ঝালি মাথে,

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে—
হা প্রাণ শচীদুলাল ব'লে।
রাঘব ভাসে নয়ন জলে॥ —মাতন

এ সময়ে বাবাজী মহারাজের বালকবৎ ক্রন্দন দেখে মনে হ'ল বাবাজীমহারাজই যেন সেই রাঘব পণ্ডিত। যখন যে লীলাটি কীর্ত্তন ক'রতে থাকেন যেন সেই ভূমিকায় তিনি নায়করূপে মূর্ত্ত হয়ে দাঁড়ান। এইটাই তাঁর কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। কীর্ত্তনীয়ার সমগ্র সত্তা সেই লীলাকারীতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত না হ'লে এ অবস্থা হয় না—যাকে বলে তদ্গতচিত্ত বা তদ্ভাবাবিষ্ট। রাঘবের আর্ত্তিটি বাবাজী মহারাজে এমনই ভাবে রূপায়িত হ'য়েছিল যে কীর্ত্তনের প্রতিটি অক্ষর যেন জীবন্তভাবে ধরা দিয়েছিল সেই অঙ্গনে। তাই না তাঁর কীর্ত্তন আলোচনা প্রসঙ্গে দেশ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন ব'লেছিলেন—"বাবাজী মহা-রাজের কীর্ত্তন কল্পনার জাল বুনে রচিত নয়। একেবারে দেখা আর বলা। যাকে বলে ধরা আর পড়া। কোন ফাঁক নেই। তাই তাঁর কীর্ত্তনাবলী এত সুসিদ্ধান্তসম্মত ও ভাবরসে পরিমার্জ্জিত।"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা ব'লে রাখি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কালে অনুষ্ঠিত অনেক লীলাই কালের প্রভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাবাজী মহারাজ অনেকগুলিরই পুনঃঅনুষ্ঠান করেন তার মধ্যে ঝালি সমর্পণ লীলাটি অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এক বৎসরকাল সেবার উপযোগী নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য পাণিহাটির রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী দেবী বাৎসল্য প্রীতির রসে সারা বৎসর ধ'রে তৈয়ার

ক'রে রাখতেন, রথযাত্রার সময় গৌড়দেশের ভক্তগণ নীলাচলে এলে তাদের সঙ্গে সব পাঠিয়ে দিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সে সব দ্রব্যের বর্ণনা আছে। বর্ণনামত সকল দ্রব্য কি জানি কি করে মহাপুরুষের বিচিত্র প্রভাবে ভারে ভারে স্বাভাবিকভাবে আপনা আপনি সংগৃহীত হ'ত। সে সব দ্রব্য লোকের মাথায় সারিবদ্ধ-ভাবে সাজানো হ'লে একটি দীর্ঘ দ্রব্য মিছিলরূপে শোভা পেতে থাকতো। আর এদের পশ্চাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজ গেয়ে চলতেন, "ঝালিমাথে নীলাচল পথে, যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে ॥"

কীর্ত্তনের ধুয়া ধ'রে বাবাজী মহারাজ অগ্রসর হ'তে থাকলেন। ক্রমে কীর্ত্তনমণ্ডলী জগন্নাথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হ'লে তিনি কীর্ত্তনে আখর দিলেন—

আসি রাঘব সিংহদ্বারে, যারে দেখে সুধায় তারে
—(বলে) দয়া ক'রে ব'লে দাও,
ওগো নীলাচলবাসী! দয়া ক'রে ব'লে দাও
কোন্ পথে যাব কাশী মিশ্রের ঘরে?
বলে দাওগো দয়া ক'রে।
কোন্ পথে যাব কাশী মিশ্রের ঘরে?
দেখিব সে প্রাণ গোরারে।
যাব কাশী মিশ্রের ঘরে ॥ (—মাতন)

এই কীর্ত্তনের মাতন নিয়ে বাবাজী মহারাজ অগ্রসর হ'লেন ও ক্রমে কাশী মিশ্রের দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে আঁখর দিলেন—

এই কি কাশী মিশ্রের বাড়ী?
করযোড়ে রাঘব সুধায়, এই কি কাশী মিশ্রের বাড়ী?

আমাদের দয়া ক'রে লয়ে চল

ওহে কাশীমিশ্রালয়বাসী, আমাদের দয়া করে

লয়ে চল

আমরা দেখব প্রাণের গোরাশশী।

ল'য়ে চল কাশীমিশ্রালয়বাসী॥ (মাতন)

ক্রমে গম্ভীরা দ্বারে উপস্থিত হলে বাবাজী মহারাজের ব্যাকুল আর্ত্তনাদে সকল জনতার হৃদয় মথিত করে এক বেদনা জেগে উঠল। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি কীর্ত্তন ধ'রলেন—

"কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায়।

(আমরা) গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়॥

আসি রাঘব গম্ভীরা দ্বারে,

ব্যাকুল হয়ে রাঘব কাঁদে।

(বলে) কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর গোরা নটরায়,

গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়।

কোথা প্রাণ বিশ্বম্ভর ব'লে,

গম্ভীরা দ্বারে রাঘব ডাকে।

এই তো গম্ভীরা ঘর,

কোথায় আছ বিশ্বম্ভর ?

বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন।

বারেক করুণা করি দেহ দরশন।

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর কাছে শ্রীশ্রীগৌরমণ্ডলের মহাভাগদের আগমন বার্ত্তাটুকু নিবেদন ক'রে যা বলছেন, বাবাজী মহারাজ তাই কীর্ত্তনে বর্ণনা করলেন—

দময়ন্তী যত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া।
আইলাম নীলাচলে ঝালি সাজাইয়া॥
তোমা না দেখিয়া সবে বিষাদে মগন।
একবার দেখা দাও শ্রীশচীনন্দন॥

তিনি প্রেমধারায় ভেসে যাচ্ছেন। গম্ভীরার ছাদ আলিন্দ লোকে লোকারণ্য, ক্ষুদ্র দালানসংলগ্ন চত্বরে যেটুকু স্থান আছে তাতে তিল ধারণের উপায় নাই। এবার বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন সহকারে এক একটি দ্রব্যের নাম ক'রে ভাবাবেশে প্রভু-পরিচারক গোবিন্দ জ্ঞানে গম্ভীরা গৃহের পূজারীর হাতে ঝালি সমর্পণ করছেন—এক একটি দ্রব্য তুলে দিচ্ছেন আর গাইছেন—

"ধর ধর লও হে গোবিন্দ!"
(রাঘব বলে) "ধর লও হে গোবিন্দ! রেখো যতন করে।
মনোভাব বুঝি তুমি দিও গৌরাঙ্গেরে॥
দময়ন্তী দেবী সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্ত্তি,
দিয়াছেন গৌরাঙ্গে করি কত আর্ত্তি॥
ধর ধর লও হে গোবিন্দ!"

অপরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যেন করেন উপভোগ॥
হেন মতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল।
ভোজন গৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল॥

—রাঘবের ঝালি-সমর্পণ শেষ হল। এতক্ষণ শ্রীধর তাঁর

খোড় মোচা নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। রাঘবপণ্ডিত কত সুস্বাদু দ্রব্য এনেছেন। তিনি কি করে সেখানে এই সামান্য খোড় মোচা প্রভুকে দিবেন! তাই শ্রীধর বড় ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন— কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত? নদীয়ার বাজারে আর কেন যাও না তুমি? খোড় মোচা ল'য়ে বাজারে ব'সে, কতক্ষণে আসবে বলে, আমি নিতুই চাই পথপানে—খোড় মোচা জোর ক'রে তুমি হাত থেকে কেড়ে নেবে সেই আশায় চেয়ে থাকি প্রতিদিন। নদীয়ার বাজারে তোমায় ক'দিন না দেখতে পেয়ে খোড় মোচার ঝালি নিয়ে আমি এসেছি।

—আমার হাত থেকে খোড় মোচা
আর কি তেম্নি ক'রে কেড়ে নেবে না?
হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে
তেম্নি ক'রে নাচবে না?
আর কি নদে' যাবে না?

কোথা প্রাণ শচীদুলাল, তেম্নি ক'রে কেড়ে নাও।
হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে, তেম্নি ক'রে কেড়ে নাও॥

—তারপর ভক্তবৎসল কত আদরে সেই খোড় মোচা গ্রহণ করলেন।

এই অপূর্ব্ব লীলা কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীধরের দৈন্য আর প্রভুর ভক্তবাৎসল্য কীর্ত্তনের সুরে মধুর হয়ে ফুটে উঠেছিল। সমগ্র জনতা বাবাজী মহারাজের মুখে শ্রীধরের দৈন্যোক্তিকে সাক্ষাৎভাবে তখন উপভোগ করছে, দরবিগলিতধারে তাদের অশ্রু বর্ষণ হচ্ছে। সে করুণ স্মৃতি আজও আমায় ব্যাকুল করে তোলে।

পরদিন সোমবার ৯ই আষাঢ়। সকাল সকাল প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়ে অপেক্ষা করছি, এবার বাবাজী মহারাজ গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলায় বেরুবেন এই আকাঙ্ক্ষায়। যে দিক দিয়ে বাবাজী মহারাজ যাবেন সে রাস্তার দুধারে ভীড় করে বহু দর্শনার্থী অপেক্ষমান। বেলা ৭টা নাগাদ মঠ বাড়ীতে শ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের সম্মুখে বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন—

আজু শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ ॥
—ইত্যাদি

গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলার সংক্ষেপিত বিষয় বস্তুটি এই যে, নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরহিনী শ্রীরাধার আবেদনটি জানাচ্ছেন, নিশাশেষে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, ব্রজের জীবন-ধন ব্রজে আসবেন। তাই স্বরূপ দামোদর ও রাম রায়ের গলা জড়িয়ে কিশোরীভাবিত মহাপ্রভু বলছেন 'ও ললিতা! ও বিশাখা! প্রাণবঁধু কাল ব্রজে আসছেন! চল! শীঘ্র আমরা কুঞ্জকে মনোরম করে সাজাই।' এই বলে গৌরকিশোরী কুঞ্জ সজ্জার সম্ভার নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছেন।—এই মধুর লীলাটি স্মরণ করে বাবাজী মহারাজ সকাল ৮টা নাগাদ মঠ বাড়ী থেকে পথে নামলেন।

প্রেমিক মহাপুরুষের সঙ্গে চলেছেন অসংখ্য বাঙ্গালী উড়িয়া ও নানা দেশের ভক্তবৃন্দ। সকলেরই কাঁধে কলসী ও হাতে সম্মার্জ্জনী। লীলা স্মরণ-কীর্ত্তনে লীলাময়ের ভাবভঙ্গী থেকে আরম্ভ ক'রে সব কিছুই যেন শ্রীল বাবাজী মহারাজে প্রতিফলিত হয়েছিল

পরিপূর্ণভাবে। তাই আজকে বাবাজী মহারাজকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ভাবময়ী প্রেমিকা বালিকা। কাঁখে কলসী, হাতে সম্মার্জ্জনী আর ঠোঁটে মৃদুমন্দ হাসি। বহির্ব্বাসের খানিকটা অংশ মাথায় জড়ান! কি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'য়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত ভিন্ন আর কাউকে বোঝাবার মত নয়। পথে চলে যেতে দেখা গেল বাবাজী মহারাজের ঠমকে ঠমকে এক অদ্ভূত নৃত্যভঙ্গিমা, আর তার ফাঁকে ফাঁকে কীর্ত্তনে নূতন নূতন ভাবের কত বিচিত্র আখর-সংযোগ এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি ক'রছিল। বাবাজী মহারাজ চরণে চরণ ছেঁদে নৃত্য ক'রতে ক'রতে চলেছেন আর শ্রীমুখে কীর্ত্তন ক'রছেন—

আসছে আমার প্রাণ বঁধুয়া,
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া।
নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।
সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।
দক্ষিণে মধুমতী নরহরি,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।

(সঙ্গে) নিতাই গদাধর নরহরি,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।
নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।

নিকুঞ্জ সেবা সম্ভার সঙ্গে করি,
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।
ঘিরে পারিষদ সহচরী
হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী।
—ইত্যাদি

কত লিখব? সে যেন এক অনন্ত ভাবের উৎস। যেন শেষ নাই। একের পর এক যেন অমৃতের লহরী তুলছে। জগন্নাথের সিংহদ্বার থেকে গুণ্ডিচাবাড়ীর দূরত্ব হবে প্রায় ক্রোশ দেড়েক। প্রতি বৎসর প্রচণ্ড রোদে এতটা পথ যেতে ভক্তবৃন্দ খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। চড়া রোদ মাথায় করে এতটা পথ যেতে হলে বেশ শক্ত সমর্থ হওয়া দরকার। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজ যেন কি এক অলৌকিক বলে বলীয়ান। শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৃত্যগীত সহকারে কাঁখে কলসী আর করে সম্মার্জ্জনী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। শ্রীমুখে এক অপূর্ব্ব দিব্য প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। সর্ব্বচিত্তরঞ্জন কি মনোরম নৃত্যভঙ্গী। এ দৃশ্য ভুলবার নয়।

কয়েকদিন এখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প'ড়েছিল। কিন্তু পূর্ব্বদিন মৃদু বারিবর্ষণ হওয়ায় ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ভক্তবৃন্দের সেদিন কোন ক্লেশ হয়নি। এই পরিবেশ উপলক্ষ্য ক'রে তিনি আখর দিলেন, "কুঞ্জে যাবেন গৌরকিশোরী, তাই বর্ষি বারি তাপ নিবারি, লীলাশক্তি হ'লেন অনুকূল।" এইরূপে কীর্ত্তনের সুরের তরঙ্গে যেন জনসমুদ্র ভেসে চ'লেছে অনায়াসে। কোন আড়ম্বর নেই, পরিপাটি নেই, অপেক্ষা নেই যেন কোন অলক্ষ্য শক্তির

প্রভাবে চ'লেছে এই সব অনুষ্ঠানধারা। চিন্তা ক'রলে স্তম্ভিত হ'তে হয় যে বাবাজী মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি বড় দানই না ক'রে গেছেন। সমাজের মূলে ছড়িয়ে পড়েছে এর প্রভাব। বাঙ্গালী তা কোনদিন ভুলবে কি করে? তিনি সমাজের গোড়া ধ'রে চিকিৎসা ক'রে গেছেন। রোগী কিন্তু টের পায়নি কোথা থেকে কি হ'ল। যা হো'ক ক্রমে কীর্তনমণ্ডলী গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছাকাছি এসে পৌঁছলে আখর দিলেন—

(কাল) ব্রজে আসবে কালশশী,
আজ পোহালে দুখের নিশি
(কাল) ব্রজে আস্‌বে কালশশী।
তাই চ'লেছি দিবাভাগে,
কুঞ্জ সজ্জা মনসাধে, তাই চ'লেছি দিবাভাগে।
আজ কুঞ্জ সাজাব,
কাল পরাণ বঁধু পাব। [মাতন]
পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে,
গৌরকিশোরীর কথা শুনে
পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে।
মৃদু মন্দ মন্দ হাসে,
পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে।
(বলে) আবার দেখব কুঞ্জবনে
রাই কানু একাসনে।
(বলে) আবার দেখব কুঞ্জবনে—

এভাবে নানা রঙ্গে কীর্তন ক'রতে ক'রতে গুণ্ডিচাদ্বারের

সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। সেখানে একটী বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করার পর মন্দিরে প্রবেশ ক'রে কীর্ত্তন ধ'রলেন—

ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে,
কাল ব্রজবাসী জীবন পাবে।
জুড়াবে গোপীর মনজ্বালা
(হেরি) কেলি কদম্বমূলে কালা।
জুড়াবে গোপীর মনজ্বালা।
এত বলি গৌরকিশোরী
স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি—
(বলে) ও ললিতে! ও বিশখে!
কুঞ্জ সজ্জা কর সবে।
এত বলি গৌরকিশোরী মৃৎকুম্ভ কাঁখে করি,
সম্মার্জ্জনী করে ধরি
গুণ্ডিচা মার্জ্জন করে।

এবার ভক্তগণের মধ্যে মৃৎকুম্ভ ভ'রে জল আনার পালা প'ড়ল। আবালবৃদ্ধ নরনারীর মনে কি আনন্দ শিহরণ! বাবাজী মহারাজ রত্নবেদীর উপর ঝাঁট দিতে আরম্ভ ক'রলেন। আর সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনিসহ কেহ বা কুম্ভ কুম্ভ জল-সিঞ্চন কেহ বা ঝাঁট দিতে আরম্ভ ক'রলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে—সারা মন্দিরের গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।

বৎসরের মধ্যে এইদিনটিতে ভক্তবৃন্দের আনন্দোচ্ছল রঙ্গে গৃহপ্রাঙ্গনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। সে এক অপূর্ব্ব লীলা, আর অপূর্ব্ব দৃশ্য! শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলা প্রকাশ করে-

ছিলেন, আজ বাবাজী মহারাজের কৃপায় সেই লীলা প্রাণ ভ'রে উপভোগ করে ধন্য হলাম।

এ প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন কৃত্যটী রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এ লীলাটী কেবলমাত্র গ্রন্থের দু'চার ছত্রেই আশ্রয় পেয়েছিল—আনন্দ অনুষ্ঠানের কোন বালাই ছিল না। পুরীর বড় বাবাজী মহাশয়ের (শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজীর) আপ্রাণ চেষ্টায় ও উদ্যমে এই উৎসবের পুনরুদ্ধার হয় আর শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে এই লীলাটিকে ফুটিয়ে তোলেন জনচিত্তে, দিব্যমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ক'রে।

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জনা করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
পারিষদ সঙ্গে রঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নে যায়॥

এবার বাবাজী মহারাজ ভক্তগণ সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। সকলেরই আগ্রহ ইন্দ্রদ্যুম্নে তাঁর কিশোরী আবেশে গৌরের জলকেলি উদ্দীপনাত্মক কীর্ত্তন শুনবার জন্য। কেউ কেউ বা ঘাটের পাণ্ডার কাছে তেল মেখে জলে নেমে প'ড়লেন। আমিও তাদের সঙ্গী হ'লাম। ইন্দ্রদ্যুম্নের জল ভক্তগণের অবগাহনে তোলপাড় হ'য়ে উঠল। এবার বাবাজী মহারাজ শত শত ভক্ত সঙ্গে সরোবরে নামলেন। আমার মনে কেবলই এই কথা জাগছিল যে জলে নেমে বাবাজী মহারাজ কি ক'রে কীর্ত্তন করেন দেখতে হবে! আমি ঠেলাঠেলি ক'রে বাবাজী মহারাজের কাছাকাছিই স্থান ক'রে নিলাম। কোমর

জলে বাবাজী মহারাজ বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ দ্বারা বেষ্টিত। বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গ রক্তাভ। কে যেন আবির মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিয়েছে।

বাবাজী মহারাজের অধরে মৃদুমন্দ স্মিত হাসি। নয়নে কি এক অভিনব অতীন্দ্রিয় দিব্য চাহনি। তিনি করতলে কর স্পর্শ ক'রে স্থির ও ধীর কণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন—"গৌরপ্রেম সরোবর কি অপরূপ মনোহর" ইত্যাদি। জলের উপর থাবড়ি মারছেন আর সুরের তাল দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গাইছেন। কোন বাদ্যযন্ত্র নেই অথচ কি সুরমাধুর্য্য। বাবাজী মহারাজ এক একটি করে পদ বলছেন আর শত শত ভক্তকণ্ঠে ঝঙ্কার উঠ্ছে। কোন দিন ভাবতেই পারিনি শুধুকণ্ঠে এত সুরমাধুর্য্য ফুটে উঠতে পারে। কণ্ঠ দিয়ে যেন বংশীধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে।

কিশোরী আবেশে গৌরের জলকেলি কীর্ত্তনের সময় ভক্তগণ সকলে সকলের গায়ে জল দিতে আরম্ভ ক'রলেন। কেউ কেউবা শ্রীল বাবাজী মহারাজের অঙ্গে জল দিচ্ছেন কত না উল্লাস ভরে। এ লীলার মাদকতা সকলকে আত্মহারা করে তুলেছে। বাবাজী মহারাজ কত নব নব আখরে গৌরের ইন্দ্রদ্যুম্নে আগমন ও যমুনার স্মৃতি উদ্দীপনে জলকেলির রহস্য কথা ব'লছেন। সে এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখি গোরা যমুনা উদ্দীপনে
আনন্দে জলকেলি করে নিজগণ সনে॥

এবার ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি কীর্ত্তন শেষ হ'ল। বাবাজী মহারাজ আইটোটা বাগানের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

—ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি করি গোরা স্নায়।
নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে আইটোটায় যায়॥
আইটোটায় যায় গৌরহরি।
ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করি।
আইটোটায় যায় গৌরহরি॥ (মাতন)

এই কীর্ত্তনের ধুয়া ধরে বাবাজী মহারাজ যখন আইটোটায় এসে পৌঁছলেন তখন হবে বেলা প্রায় একটা। শুনলাম, এই বাগানটিতে নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তনে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম ক'রেছিলেন এবং সেই সুযোগেই রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর পাদসম্বাহন করেন। এই বাগানটি বাবাজী মহারাজের ইচ্ছায় কেনা হয় ও লীলার উদ্দীপক হিসাবে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বজায় রাখা হয়।

বাবাজী মহারাজ আবেশভরে কীর্ত্তন করে চলেছেন—
আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন।
নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন॥
বসাইলা সারি সারি
নিজগণে গৌরহরি,
বসাইলা সারি সারি—
মাঝে বসিলেন গৌরহরি।

—মহাপ্রসাদ করেন ভোজন,
নিজগণ সনে প্রাণ-শচীনন্দন
মহাপ্রসাদ করেন ভোজন।

স্বরূপ গোঁসাই করেন পরিবেশন,
মহাপ্রসাদ করেন ভোজন।
আনন্দের পাথার বয়ে যায়,
এই আইটোটা উপবনে
আনন্দের পাথার বয়ে যায়।
মহাপ্রসাদ ভোজন লীলায়।
আনন্দের পাথার বয়ে যায়। (মাতন)

বাবাজী মহারাজ আখরে আখরে এই আইটোটা উপবনে প্রভুর স্বগণসহ ভোজনরঙ্গটি সেদিন এমনই নিপুণভাবে বর্ণনা করলেন যে ভক্তগণের আনন্দ আর ধরে না। কীর্ত্তন সমাপ্তি-মাত্র সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে বসে গেলেন প্রসাদ পেতে। আমি কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। মনে মনে তখন এই কথাই ভাবছি—কে বলে লীলা অপ্রকট? কি অপরূপ শোভা ধারণ করেছে ভক্তবৃন্দের এ অপূর্ব্ব সম্মেলন! ভারে ভারে জগন্নাথের প্রসাদ আসতে আরম্ভ হ'ল। কোথা থেকে আসছে, কে আন্‌ছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কোন বাধা নাই, কোন নিষেধ নাই, চেনা অচেনা নাই। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিতের কোন বালাই নাই। সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত। এস, আর পাতা পেড়ে বস। যেন মা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের মালিক শ্রীল বাবাজী মহারাজ। তিনি কিন্তু বসে আছেন ধীর স্থির—নিন্দা স্তুতির উর্দ্ধে।

ভক্তবৃন্দের ভিতরে বাবাজী মহারাজের অলৌকিক শক্তির আলোচনা হচ্ছে। কেউ বা কীর্ত্তনে তাঁর অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি

সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কেউ বিস্ময়ে হতবাক এই ভেবে যে, ভিখারী বৈরাগী যিনি নিজে কখনও একটি পয়সাও হাতে স্পর্শ করেন না, তাঁরই প্রভাবে সহস্র সহস্র লোক প্রসাদ পেয়ে যাচ্ছে কি করে? কে দিচ্ছে? চিন্তা করে কূল পাচ্ছে না। কে যেন ভূতের বোঝা বহার মত সব জিনিষপত্র পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে।

একদিন বাবাজী মহারাজকে ব'লতে শুনেছি—"তোমরা যা কিছু দেখ, এর জন্য আমি কিন্তু এতটুকুও চিন্তা করিনে। আমি বসে থাকি শ্রীগুরুদেবের মুখ চেয়ে। তাঁর সংসার তিনি যা করবেন তাই হবে। আমি মাঝখান থেকে চিন্তা করে কেন কাজ বাড়াই! বড় কর্ত্তা (চরণদাস বাবাজী) এ সবের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তবুও ত আমাদের বিশ্বাস আসে না। সেইজন্যই ত এত ঘোরপ্যাঁচ।"

যাহোক ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আমরাও প্রসাদ পেতে ব'সেছি। যেন আনন্দের হাট ব'সেছে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কোন ভেদ নাই, ধনী দরিদ্রে কোন তারতম্য নাই। আজ যেন সব একাকার। আমি যেন কি এক অদ্ভুত আনন্দ প্রবাহে বিভোর। ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে কেউ বা লোচনদাসের ধামালী গাইছেন। কেউ বা ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা, আবার কেউ বা প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষার ধ্বনি দিচ্ছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা যাবৎ প্রসাদ পাওয়ার পর্ব্ব চ'লল। বেলা চারটা নাগাদ আমাদের বাসায় ফিরবার পথে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সারা রাত্রিব্যাপী আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'য়ে রইল।

মঙ্গলবার ১০ই আষাঢ়। পূর্ব্বদিনের জলবৃষ্টির পর মেঘলা অবস্থায় প্রভাত হ'ল। বেলা যতই বাড়ে আকাশের অবস্থা ততই ঘনঘটাচ্ছন্ন হ'তে থাকে। কখনও সবেগে, আবার কখনও বা মৃদু মৃদু বৃষ্টিপাত হ'চ্ছিল। সমবেত জনতা সিংহদ্বারের দিকে উৎসুক-নেত্রে চেয়ে আছে, এই বুঝি পহুণ্ডি বিজয় আরম্ভ হয়। পহুণ্ডী বিজয় মানে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার রথে আরোহণ পর্ব্ব। শ্রীজগন্নাথের পহুণ্ডীবিজয় অপরাহ্ণ ৫টার পূর্ব্বে হ'ল না।

এদিকে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সমভাবেই চ'লেছে। শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথের রথে আরোহণ ক'রতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। পরে খবর পেলাম, আজ আর রথে টান্ প'ড়বে না। আগামীকল্য রথ চ'লবে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনসহ রথের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম সেরে আশ্রমে ফিরলেন। রথ না চলায় আমরা সকলেই বিষণ্ণ-মনে সেদিনকার মত বাসায় ফিরে এলাম।

বুধবার, ১১ই আষাঢ়। সকাল থেকে সমভাবেই অজস্রধারে বারিবর্ষণ হ'চ্ছে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে সেই সময় রথে টান প'ড়ল। সর্ব্বক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার দরুণ রাস্তায় বিশেষ ভীড় হ'তে পারেনি। খুব সহজভাবেই রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ক'রলাম, এমন কি রথের দড়ি টানবার সৌভাগ্যও পেলাম কিছুমাত্র বেগ না পেয়ে। সর্ব্বক্ষণ ভিজে ভিজেই চলেছি রথের সঙ্গে সঙ্গে। অগণিত নরনারী কেউ বা দোকানে দাঁড়িয়ে কেউ বা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রথযাত্রা দর্শন ক'রছেন।

ক্রমে বৈকাল ৪টা নাগাদ বৃষ্টির বেগ অপেক্ষাকৃত কম হ'ল। আমাদের মনে এই প্রশ্নের খোঁচা মারছে এই বৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ কি বেরুবেন? কারও সাহস নেই তাঁকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে। তিনি পরমগম্ভীর। কি যেন এক অতীন্দ্রিয় সত্তার চিন্তায় মগ্ন। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যেদিন যে লীলা অনুষ্ঠানের ব্যাপার থাকে তিনি সেইভাবে এমনই মত্ত থাকেন যে বাইরের অন্য কিছু বলবার বা চিন্তা করবার অবসর পান না।

এদিকে ভক্তবৃন্দের মধ্যে রটনা হয়ে গেল, এ বৎসর বোধহয় বাবাজী মহারাজ রথাগ্রে কীর্ত্তনে বেরুতে পারলেন না। আমি মনে মনে আপশোষ করছি যদিও বা ভাগ্যে পুরী আসা হ'ল তা বাবাজী মহারাজকে রথাগ্রে না দেখতে পেলে যেন সবই বাকী থেকে যায়। জলে ভিজে ভিজেই চলেছি কিছুদূর পর্য্যন্ত। এমন সময় দেখি নিকটস্থ এক গলির ভিতর থেকে এক বিরাট কীর্ত্তন বাহিনীর মধ্যে বাবাজী মহারাজ মত্ত সিংহের মত চতুর্দ্দিক কীর্ত্তনের মহারোলে কম্পিত ক'রে এগিয়ে আসছেন। ক্রমে তিনি জগন্নাথের রথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আনন্দে আত্ম-হারা হ'য়ে কীর্ত্তন দলের সঙ্গে মিশে গেলাম। বাবাজী মহারাজ ভাবগদগদ কণ্ঠে কীর্ত্তন ধরলেন—

আবেশে বলে গোরারায়
স্বরূপ রামারায়ের করে ধরি,
আবেশে বলে গোরা রায়—

বলে দেখ দেখ প্রাণসখি!
হেলে দুলে আস্‌ছে।
রথোপরি বংশীধারী,
হেলে দুলে আস্‌ছে।

নব অনুরাগ হিল্লোলে,
হেলে দুলে আস্‌ছে।
আজ নব রসের হিল্লোলে
হেলে দুলে আস্‌ছে।
গোপীর মনোরথ পুরাবে ব'লে,
হেলে দুলে আস্‌ছে।
আসিছে ব্রজের মনমথ।
পুরাইতে গোপীর মনোরথ।
আসিছে ব্রজের মনমথ॥ (মাতন)

(তখন) আবেশে রামরায় বলে।
ভাবনিধি গোরার মরম জেনে
আবেশে রাম রায় বলে।
(আবেশে) রামরায় করে গানে।
ভাবনিধি গোরার মরম জেনে
(আবেশে) রামরায় করে গানে।
"(আমাদের) শ্রীরাধারমণ, রমণী-মনোমোহন,
বৃন্দাবন-বনদেবা।"

ঐ আস্‌ছে প্রাণের রাধারমণ
শ্রীবৃন্দাবিপিন-বিহারী
ঐ আস্‌ছে প্রাণের রাধারমণ
ঐ রসময় বংশীধারী
আস্‌ছে প্রাণের রাধারমণ।
"শ্রীবৃন্দাবন-বনদেবা"
অভিনব রাস—রসিকবর নাগর
নাগরীগণকৃত-সেবা।
ব্রজপতি দম্পতি হৃদয়-আনন্দন
নন্দন নব-ঘন শ্যাম।—ইত্যাদি ইত্যাদি

কত বর্ণনা ক'রব। এক একটি পদ গাইছেন আর আখরে আখরে তার বিস্তার চলেছে। কি অনবদ্য বর্ণনা ভঙ্গি!

বাবাজী মহারাজ এবার ভাবাবিষ্ট। কখনো অট্ট অট্ট হাসছেন, কখনও বা অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করছেন। আর অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারগুলি যুগপৎ তাঁর শ্রীঅঙ্গে তৎকালে শোভা পাচ্ছে। শ্রীজগন্নাথের বদন পানে তাকিয়ে অনিমেষ নয়নে ভাবের আবেশে কত পদ পদাবলী গাইছেন, আবার কখনও বা প্রেমভরে চরণে চরণ রেখে নৃত্য করছেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ যে-ই একবার দেখেছে সে চুম্বকাকৃষ্টের মত আটকে যাচ্ছে।

রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন লীলা—প্রভু যখন চলেন জগন্নাথও তখন চলেন। আবার প্রভু যখন স্থির হন জগন্নাথও অচল হন। কখনো রাধাভাব বিভাবিত প্রভু জগন্নাথের কাছে

এতদিনের অদর্শনের জন্য অভিমান প্রকাশ করেন, কখনো বা আলাত চক্রের মত ঘুরতে থাকেন। এইসব লীলা বাবাজী মহারাজ নব নব আখরের মাধ্যমে প্রকট করে তুললেন। লীলা-মাধুর্য্য রসে পরিনিষিক্ত হ'য়ে ভক্তগণের আনন্দ আর ধরে না। আমি ত এসব দেখে শুনে হতবাক। যা কখনও দেখিনি তাই দেখলাম, যা কখনও শুনিনি তাই শুনলাম। যা আমার কল্পনার অতীত তাই আমার কাছে অনবদ্য রূপে ব্যক্ত হল। অপরাহ্ন ৬টা নাগাদ জগন্নাথের রথ গুণ্ডিচায় পৌঁছলে বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন ধরলেন—

প্রেম স্বরে বলে গোরা।
গুণ্ডিচা দ্বারে জগন্নাথ পেয়ে
প্রেম স্বরে বলে গোরা—
ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম জেনে
প্রেম স্বরে বলে গোরা।
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে,
জগন্নাথের বদন চেয়ে
কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে—
"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম।
ঐ অলকা-আবৃত বদন,
বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম।

ঐ মুরলী-রঞ্জিত বদন,
বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম।
ঐ হাসিয়া-বাঁশিয়া বদন,
বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম।
প্রাণ আছে তাই দেখতে পেলাম।
তোমার অদর্শনে বিরহেতে,
প্রাণ আছে তাই দেখতে পেলাম।
"দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
তোমার কোন দোষ নাই বঁধু
সকলই আমার করমের দোষ—
তোমার কোন দোষ নাই বঁধু
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল?
পরাণ বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে?
আমার যা ছিল তা হল কপালে,
পরাণ বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে?—(মাতন)
"সে সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমারই কুশলে কুশল মানি ॥
(বঁধু) তোমার সুখেই আমার সুখ।
আপন দুখে মানি না দুখ,
(বঁধু) তোমার সুখেই আমার সুখ ॥

তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
এত যে সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥

এভাবে বাবাজীমহারাজ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন করতে থাকলেন। সে সব চরম রসের কথা। আমার মত অপক্কবুদ্ধি যুবকের পক্ষে সব কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। বাবাজী মহারাজ একেবারে ডুবে গেছেন। কোন বাহ্যস্মৃতি নাই। সারা মুখমণ্ডল রক্তাভ। এ বৃদ্ধ বয়সে বাবাজী মহারাজের যৌবনোচিত উদ্দাম আবেশ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন লীলা-শক্তি তাঁকে তারুণ্যামৃত ধারায় অভিষিক্ত করেছেন। এ রসোচ্ছ্বাস ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরূপ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার কখনো দেখিনি। দর্শনার্থীকুল রথে জগন্নাথ দর্শন করছেন আর বাবাজী মহারাজের ভাবোচ্ছল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছেন অনিমেষ নয়নে। জগন্নাথের দর্শন মাধুর্য্য ফুটে উঠেছিল বাবাজী মহারাজের নৃত্য গীতের মাধ্যমে।

সে স্মৃতি আমার জীবনব্যাপী অনুধ্যানের বস্তু হয়ে উঠুক —এই আমার চরম ও পরম কামনা। আজও কত অবসর মুহূর্ত্তে বাবাজী মহারাজের সেই নৃত্যোচ্ছল ভাবরক্তিম মূর্ত্তি ভেসে ওঠে মানস নয়নে। রথে জগন্নাথ দেখবার জন্য জনসঙ্ঘের যেমন আকর্ষণ, তেমনই রথাগ্রে বাবাজী মহারাজের নৃত্যোচ্ছল ভাব-বিহ্বল মূর্ত্তি দেখবার আগ্রহ। প্রকৃত কথা বলতে কি, রথাগ্রে বাবাজীমহারাজের মূর্ত্তিটি পর্য্যন্ত বদলে যায়। তাঁর মাতোয়ারা ভাবে 'আপনি মেতে জগৎ মাতানো' স্বভাবটি ফুটে ওঠে!

রসমাধুর্য্যের পরম নির্য্যাস রয়েছে তাঁর নৃত্যে! সেই রসেরই পরম প্রকাশ অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে দর্শকদের সকলকেই মাতিয়ে তোলে সেই ভাবময়ের ভাবের বিচ্ছুরিত কিরণ প্রভায়। নইলে কে বুঝবে জগন্নাথকে আর তার লীলাকে? হয়ত পুঁথি ঘেঁটে কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু এমন করে পিয়ে পিয়ানো স্বভাবের সংস্পর্শে না এলে এত মধুর হতো না।

ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভাবের অভাব দেখতে পারে না। তাই শক্তি সঞ্চার করে, সেই অভাব ঘুচিয়ে লীলা ভোগ করায়। আমাদের বেলাতেও তাই। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধুর পদ পদাবলী জগতে চিরকাল থাকবে কিন্তু পরিবেশনের মাধ্যম ছাড়া ফুটে উঠবে না। কীর্ত্তন শেষ হলে বাবাজী মহারাজ আইটোটা বাগানের দিকে অগ্রসর হলেন। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। কীর্ত্তনে আখর চলল—"এ ত নয় বারি, এ যে নব মিলন মাধুরী।"

বাবাজী মহারাজ সেদিন আইটোটাতেই রইলেন। আমরা যে যার বাসায় ফিরলাম—অন্তরে চলতে লাগলো অপূর্ব্ব আনন্দ-গুঞ্জরণ।

পানিহাটি উৎসবে

তখন আমি স্কুলে পড়ি। আমাদের বাড়ী আহিরীটোলা ঘাটের কাছে। রোজ গঙ্গাস্নান করতাম, অবশ্য পুণ্য অর্জ্জনের জন্য নয়। কালীপূজার দিন বেলা ১১টা নাগাদ আহিরীটোলা ঘাটে স্নান ক'রবার জন্য এসে দেখি নৌকার মাঝিরা "বাবু পানি-হাটি যাবেন—দু আনা ভাড়া" বলে হাঁকছে। যাত্রীরও বেশ ভীড় হয়েছে। আমি আস্তে আস্তে যেয়ে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—মশায়? পানিহাটি কত দূরে! সেখানে কি আছে? তিনি সস্নেহে দুকথায় পুরাণের ইতিবৃত্ত বলার মত বলে গেলেন। আর বিশেষ ক'রে জানালেন—সেখানে আজ কীর্ত্তন সমারোহের বিরাট আয়োজন। তাঁরা সেই কীর্ত্তন শুনবার জন্যই যাচ্ছেন।

একে নৌকাযাত্রার লোভ তাতে আবার কীর্ত্তনের কথা শুনে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কারণ, কীর্ত্তন শুনার আমার একটু ঝোঁক ছিল। মনে নানারকম সঙ্কল্প বিকল্প করতে করতে বাড়ী ফিরলাম। বাবা যেতে দেবেন কিনা, কার সঙ্গেই বা যাব ইত্যাদি ভাবনা চলতে থাকল মনের মধ্যে। এমন সময় দেখি আমাদের এক বয়স্ক প্রতিবেশী কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে পানিহাটি যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। আমি তাঁকে জ্যেঠামশায় বলতাম আর তিনিও আমায় খুব স্নেহ করতেন। আমার মন নেচে উঠল তাঁদের সঙ্গে

যাওয়ার জন্য। বাবা মাকে কোনরকমে রাজী করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

স্রোতের মুখে নৌকা ভেসে চলেছে তর তর করে। আমার মনে পুলক শিহরণ জাগছে কত নব নব কল্পনায়। আনন্দ আর ধরে না—খাঁচায়-ধরা পাখী ছাড়া পেয়েছে। প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় ডানা ঝেড়ে উড়তে পেয়ে সে বাঁধন হারা হ'য়ে চ'লেছে। নদীর দুকূলের শোভা কত বিচিত্ররূপে ধরা দিচ্ছে চোখে। মনে নানা কল্পনার ভাঙ্গাগড়া ক'রতে ক'রতে চ'লেছি। কতক্ষণে পানিহাটি পৌঁছাব এইটাই একমাত্র চিন্তা। কীর্ত্তন আরম্ভ হ'য়ে গেলে ভীড়ের মধ্যে হয়ত ঢুকতে পারব না এই আশঙ্কা।

কত নূতন নূতন কল্পনার ছবি মনের মধ্যে জাগছে। দূর থেকে যত বড় বড় বটবৃক্ষ দেখি মনে হয়, এই বুঝি সেই বটবৃক্ষ-মূল, তারপর দেখি তা নয়। এভাবে বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ চোখে প'ড়ল দূরবর্ত্তী এক বটবৃক্ষমূলে অসংখ্য লোকের ভীড়। ঘাটে নৌকা লাগামাত্র লাফিয়ে নেমে পড়লাম। বটবৃক্ষমূলে গিয়ে শুনলাম—কীর্ত্তনের এখনও একটু দেরী আছে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলীর স্থান সংগ্রহের মহড়া প'ড়ে গেছে। অসম্ভব ভীড়!

সকলেই যেন কার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। আমরা বুঝলাম, দূর থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কীর্ত্তন শুনবার আর কোন উপায় নাই। তাই ইত্যবসরে বেরিয়ে পড়ি রাঘবের বাড়ী দেখবার জন্য। ফিরে আস্‌ছি, দেখি স্কুলবাড়ীর পশ্চিমদিকে বা মায়ের মন্দিরের সম্মুখে কাউকে ঘিরে কয়েকজন ভক্ত দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাদের ভিতর ঢুকে পড়ি। দেখলাম, হাঁ দর্শনীয় বটে!

আকাশতলে যেন দেবতা আর অনুগত গণের সঙ্গে নম্রতার আদান প্রদান হ'চ্ছে। দর্শনীয় পুরুষটিই প্রণাম ক'রছেন। কিছু পরেই মন্দিরের সম্মুখে তিনি কীর্ত্তন ধ'রলেন—

মধুর লীলাচল হ'তে,
রাঘব পণ্ডিতের প্রীতে,
প্রাণ গৌর এল পানিহাটীতে।
চল যাই দেখিতে—

আমার প্রাণে জাগলো—আমিও ত পানিহাটীতে এসেছি। আমাকে কেউ গৌর দেখাতে এনেছে নাকি? গৌরকে দেখা যায়! এই পানিহাটীতেই কি গৌর দেখা যায়? কীর্ত্তনের আখর আমার বড় ভাল লাগল। এমন আকর্ষণের ভাষা আমি ত কখন শুনিনি। মনে হ'ল ইনিই বুঝি গৌর দেখাতে আমাদের সকলকে এনেছেন। আরও উৎকণ্ঠা জাগাল। তখনও কীর্ত্তন চ'লেছে—

প্রাণ গৌর এল পানিহাটীতে,
চল যাই দেখিতে—

কীর্ত্তনের ধুয়া ধ'রে তিনি কীর্ত্তন সমেত হাজির হ'লেন গঙ্গাতীরস্থ বটবৃক্ষতলে যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর নৌকা থেকে অবতরণপূর্ব্বক অবস্থান করেন। বিশাল বটবৃক্ষতলে একটী ছোট মন্দির। পশ্চাতে কলনাদিনী গঙ্গা আর সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। নিকটে আরও কয়েকটী বটবৃক্ষ স্থানটীকে ছায়ার আবেষ্টনীতে আরও স্নিগ্ধ ও মনোরম করে তুলেছে। দক্ষিণ-দিকে একটী অর্দ্ধ-ভগ্নাবশেষ ঘাট। এই ঘাটেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ অবতরণপূর্ব্বক পানিহাটী গ্রাম ধন্য করেন।

এই বিরাট বটবৃক্ষমূলে অসংখ্য গণসমুদ্রের মধ্যে সেই পুরুষপ্রবর প্রেমগদগদ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যামৃত গ্রন্থ থেকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন কাহিনী গাইতে আরম্ভ ক'রলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়ক্রমকালে (১৫১১ খৃঃ) কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে আগমন করেন। প্রথম দুই বৎসর দক্ষিণদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলে রাজা প্রতাপরুদ্রের একান্ত অনুরোধে রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নানা অজুহাতে প্রভুকে নিবারণ করেন। এভাবে চারি বৎসর গত হওয়ার পর পঞ্চম বৎসরে গৌড়দেশের ভক্তগণ রথযাত্রা দর্শনে আসেন এবং উৎসবান্তে তাঁরা স্বদেশ ফিরে যান।

মহাপ্রভু আবার জানালেন গৌড়দেশ হ'য়ে জননী ও জাহ্নবী দর্শন ক'রে বৃন্দাবনে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছার কথা। রামানন্দ রায় চিন্তা ক'রলেন—প্রভুকে বহুবার ঠেকিয়ে রাখা গেছে। এবারে বর্ষার অজুহাতে ঠেকিয়ে রেখে বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করার যুক্তি দেওয়াই ভাল। প্রভু যদিও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পুরুষ, তবু ভক্তপরতন্ত্র, ভক্তের ভক্তিডোরে চির-আবদ্ধ। তাই ভক্তের ইচ্ছারই জয় জয়কার। এবারকার বর্ষা কাটিয়ে মহাপ্রভু অনুগতদের কাছে বিদায় নিয়ে বিজয়া দশমীর দিনই যাত্রা ক'রলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চ'লেছেন আর সঙ্গ নিয়েছে অগণিত ভক্ত অনুগামীর দল। মহাপ্রভু সপ্রণয়ে তাদের নিবারণ ক'রছেন। পদব্রজে চলতে চলতে মহাপ্রভু সদলবলে হাজির হ'লেন উড়িষ্যার ভবানীপুরে।

পরদিবস প্রাতে ভুবনেশ্বর এলেন। ক্রমে কটকে এসে গোপাল দর্শন করলেন। সে সময় রামানন্দ রায় প্রভুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করেন ও এ সংবাদ রাজা প্রতাপরুদ্রকে জানান হয়। তিনি মহিষী-গণসহ আত্মহারা হ'য়ে ছুটে এলেন প্রভু দর্শনে। রাজা কখনও ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন আবার কখনও অশ্রুজলে ভেসে ভেসে প্রভুর স্তুতি গান করেন। রাজার ভক্তি আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে প্রভু আলিঙ্গন করেন—

পুনঃস্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তার দেহ হইল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাতে কৃপা কৈল॥
ঐছে তাঁহাকে কৃপা কৈল গৌরধাম।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা জগতে হইল নাম॥

(চৈ, চ)

এভাবে কৃপা ক'রে মহাপ্রভু রাজাকে বিদায় দিলেন। গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁর রাজ্যের যত বিষয়ী আছেন তাঁদের কাছে একটী করে পত্র লিখে পাঠালেন—যে যে গ্রামে প্রভুর পদার্পণ হবে সেখানে যেন নূতন আবাস নির্ম্মিত হয়, আর তিনি যেন স্বীয় তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র অনন্যভাবে প্রভুর সেবায় তৎপর থাকেন। হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ নামে দুই মহাপাত্রকে আদেশ দিলেন একটী নূতন নৌকা নদীতীরে রাখবার জন্য। মহাপ্রভু স্নান সেরে নদীপারে চতুর্দ্ধারে যাবেন। সেখানেও প্রভুর জন্য নূতন আবাস নির্ম্মিত হবে। আবার এই নদীতীরে প্রভু

যেখানে স্নান ক'রবেন সেখানেও একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'রবার আদেশ তিনি দিলেন। অদ্যাপিও স্তম্ভটী সেই পবিত্র স্মৃতিই বহন ক'রছে—

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥

সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নান সেরে সেই নবনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ ক'রে চতুদ্বারে এলেন। সেই রাত্রে সেখানেই অবস্থান করলেন। এদিকে রাজার আজ্ঞায় প্রভুর জন্য ভারে ভারে শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ এসে হাজির হ'চ্ছে। প্রভুর সঙ্গে পুরী গোঁসাই, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, রামাই নন্দাই প্রভৃতি পার্ষদগণ এগিয়ে চ'লেছেন। গদাধর পণ্ডিতও চ'লেছেন সঙ্গে।

প্রাণের গৌরসুন্দরকে ছেড়ে কেউ ফিরে যেতে চান না। প্রভু দেখলেন, এ বড় মুস্কিলের কথা। তখন একে একে বিদায় দিতে আরম্ভ ক'রলেন। যারা গৌর বিনা আন জানে না বা আন মানে না তাদের পক্ষে গৌরকে ছেড়ে যাওয়া যে মর্ম্মান্তিক!

শ্রীমন্মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে তাঁর সঙ্গে আসতে নিষেধ ক'রে ব'ললেন—তোমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না! ফিরে গিয়ে তুমি গোপীনাথের সেবা কর। গদাধর পণ্ডিত ভেবেছিলেন প্রভু নীলাচলেই যখন অবস্থান ক'রবেন তখন টোটা গোপীনাথের সেবা অঙ্গীকার ক'রলে প্রভুর সঙ্গ ছাড়া হওয়ার কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু এ কি? ক্ষণেকের অদর্শনও যে তাঁর কাছে কোটী যুগ! গদাধর উত্তর দিলেন—

পণ্ডিত কহে যাহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটী সেবা তৎপদ দর্শন॥

গদাধর পণ্ডিত কিছুতেই ফিরবেন না, আর মহাপ্রভুও ছাড়বেন না। প্রভু নানাভাবে যখন কোনরকমেই এঁটে উঠতে পারলেন না তখন ব'ললেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

এরপর আর কোন কথা চলে না। পণ্ডিত ভূমিতলে মূর্চ্ছিত। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পণ্ডিতের সাথে নীলাচলে ফিরে যেতে আদেশ ক'রে নৌকায় চাপলেন। একে একে বিদায়ের পালা। যাজপুর এসে সঙ্গে যে দু'জন রাজপাত্র ছিলেন তাদের বিদায় দিলেন। এভাবে রেমুনায় এসে রামনন্দরায়কেও বিদায় দেবার ইঙ্গিত হ'ল—

ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে ক'রে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

পথে যেতে মহাপ্রভু কত কতই না লীলা প্রকাশ ক'রছেন। ক্রমে উড়িষ্যার সীমার কাছে এক রাজ্যে এসে হাজির হ'লেন। অগ্রবর্ত্তী পথে দুর্দ্দান্ত এক মগুপ যবনের অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বত্র জ্ঞাত। তার অধিকার পিছলদা পর্য্যন্ত। তার ভয়ে কেউ নদী

পার হ'তে পারে না। এদিকে তত্রত্য রাজঅধিকারী প্রভুকে কি ক'রে নিরাপদে নদী পার করাবেন এ চিন্তায় পড়লেন।

ইত্যবসরে যবনের অনুচর হিন্দুবেশ ধারণ ক'রে প্রভুকে দর্শন করে যান ও সব বৃত্তান্ত তাঁকে জানান—"জগন্নাথ থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। কষিতকাঞ্চন জিনি তাঁর বর্ণ। উন্নত সুন্দর সুঠাম দেহ, ভাবভরে আঁখিদুটি ঢুলু ঢুলু। সঙ্গীরা সব সিদ্ধ পুরুষ! তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণ গুণগান করছেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁদের দর্শন ক'রতে এসে পাগলের মত কেবলই কৃষ্ণ কৃষ্ণ গান ক'রে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অনুচরটিও "হরিকৃষ্ণ" নাম উন্মত্তের মত গান ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। এ বর্ণনা শ্রবণে যবন অধিকারীর মন ফিরে গেল। প্রভুর দর্শন লালসায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। এক দূত পাঠিয়ে ওড়িয়া অধীপকে জানালেন প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষার কথা।

সংবাদ শ্রবণে ওড়িয়া অধীপ প্রভুর জগৎ উদ্ধারণ লীলার জয়জয়কার দিতে আরম্ভ ক'রলেন। আর দূতকে জানালেন—তিনি এখানে এসে মহাপ্রভুকে অনায়াসে দর্শন ক'রে যেতে পারেন—যদি বিশ্বাস হয় তবে সঙ্গে পাঁচ সাতজন নিরস্ত্র ভৃত্য নিয়ে আসবেন। মদ্যপ যবনঅধীপ সর্ত্তমত প্রভু দর্শনে এলেন। দূরদর্শনে প্রভুকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম বন্দনা জানালেন। নয়ন জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে আর বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ ক'রছেন। প্রভু দর্শনে তাঁর আত্মগ্লানিসূচক খেদোক্তি পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রব করে। প্রভু তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি সঞ্চার ক'রলেন। যবন আজ মহাপ্রভু দর্শনে দিব্যলোকের সত্যানুসন্ধী দৃষ্টিতে

চক্ষুষ্মান। তাঁর প্রাণে ইচ্ছা জাগল প্রভুর কিছু সেবা করার। তখন মুকুন্দ দত্ত জানালেন—প্রভুর গঙ্গাতীর যেতে ইচ্ছা হ'য়েছে তুমি যদি এ বিষয়ে সহায় হও তবে বড় উপকার হয়।

তখন সেই যবনরাজ প্রায় দশ নৌকা ভর্ত্তি সৈন্যসহ একটি নৌকায় প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নদী পার করিয়ে পিছলদা পর্য্যন্ত এলেন। এখান থেকে প্রভু তাঁকে বিদায় দিলেন। সে বিদায় কাহিনী মর্ম্মের অন্তস্তলে এক নিবিড় আলোড়ন তোলে।

"সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপাশাটি॥
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটি গ্রামে আগমন কাহিনীটি সেই পুরুষপ্রবর দিব্য সুরের মোহনীয় ছন্দে সমবেত জনতাকে পরিবেশন করতে থাকলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্ত্তনে আখর চলছে—

আজ সেই দিনরে—
প্রাণ গৌর আইলা পানিহাটিতে,
আজ সেই দিনরে।
এসেছি আশা করে মনে।
(তোমার) ত্রিকাল সত্য লীলা জেনে,
এইত আগমন কাল জেনে,
দেখতে পাব গোরা ধনে,
(তাই) এসেছি আশা ক'রে মনে।

—হা প্রাণগোর গুণমণি! নিশ্চয় এসেছ তুমি! তুমি এসেছিলে এইখানে। এইদিনে নিজগণ সনে! তোমার রাঘবেরে দেখা দিতে, তুমি এসেছিলে এইখানে। এই গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষতলে, ক'রেছ তুমি অবতরণ! আজ তোমার আসবার দিন! একবার দেখা দাও! আমরা বড় অভাগা জেনে, দেখা দাও নিজ গুণে! এই ত সেই লীলাস্থলী! এই তরু রয়েছে সাক্ষী!

এভাবে করছেন কত আকুতিভরা আবেদন নিবেদন, সুরে সুরে আখ্যাপন। কখনও মিনতির করুণ আবেদন, আবার কখনও বা দৃপ্ত অভিমান। গৌরগণের উদ্দেশ্যে জানালেন—তোমাদের গৌর তোমরা না দেখালে আমাদের দেখবার কি অধিকার আছে? তোমরা নিজগুণে আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে একবার দেখাও। এ স্বরে মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ প্রকাশ পেতে থাকে। তারপর আবার বলছেন—

কোথা বা যাব রে!
কে সন্ধান বলে দেবে,
কোথা বা যাব রে!

অদ্ভুত পুরুষপ্রবরের লীলানুস্মৃতি। স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা সকলের কাছে গৌর সন্ধান জিজ্ঞাসা করছেন। আর নয়ন জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কার না হৃদয়ে প্রত্যক্ষ লীলানুভূতির দোলা জাগবে? নিজের আর্ত্তি ও করুণ সুরের জালে সমবেত জনতার হৃদয়তন্ত্রীকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই সকলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলই কাঁদছে। অতি বড় পাষাণ্ডও আজ বিস্ময় বিহ্বল। এবার জাহ্নবীকে উদ্দেশ করে কীর্ত্তন ধরলেন—

বল বল ওগো সুরধুনি,
কোথা প্রাণ গোরা গুণমণি।
বলে দে বলে দে!
ও গৌর গরবিনী সুরধুনি
বলে দে বলে দে!
তোমার তীরে এই পানিহাটিতে,
কোথা প্রাণ গৌর বিহরিছে!
কৈ কথা যে কৈছ না!
কে গৌর সন্ধান ব'লে দেবে!
আর কারে বা শুধাব!

বিশাল জনসমুদ্র এমন নিস্পন্দ যে, নদীর কলতান পর্য্যন্ত শ্রুত হয়। মনে হচ্ছে নদীর কলতানের তালে তালেই যেন পুরুষপ্রবরের কণ্ঠের আদান প্রদান চলেছে। নানাভাবে সুরধুনিকে গৌর-সন্ধান জিজ্ঞাসা করে এবার তিনি বটবৃক্ষরাজকে উদ্দেশ করে বলছেন—

বল বল ওগো তরুরাজ,
কোথা প্রাণ গোরা নটরাজ।
কোথা গেলে গৌর দেখতে পাব,
তরুবর বল বল।
তুমিত দেখেছ,
একবার দেখাও মোরে!
কোন কথা যে কৈলে না,
আর কার কাছে যাব?

গৌর সন্ধান জানিতে
আর কার কাছে যাব ?

বৃক্ষরাজকে লক্ষ্য করে পুরুষপ্রবরের মিনতি ভরা আবেদন একটি মাধুর্য্যঘন পরিবেশের অবতারণা করেছে। এই নিঃশব্দ আসরে পবনও যেন তার গতিবেগ সংযত করেছে। বটবৃক্ষরাজ যেন স্বভাবগম্ভীর আবেশে গৌরসন্ধানের ভাবনায় নিথর। এবার পানিহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে জানালেন—

বল বল পানিহাটিবাসী,
কোথা চিতচোরা গোরাশশী।
তোমরা পদাঙ্কিত ভূমি নিবাসী—
তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি,
বলে দাও গো দয়া করে !
(কৈ !) কেহ ত কথা কৈছ না ?

কি অপূর্ব্ব আর্ত্তি ! বিনিয়ে বিনিয়ে তিনি সুরধুনি, বট-বৃক্ষরাজ ও পানিহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে কত কথাই না জানালেন। এ আকুতিভরা আবেদনে কার না হৃদয় স্পর্শ করবে ? এ যে প্রেমরাজ্যের অমোঘ রীতি। কাকেও বাদ দিয়ে কেউ নয়। অদ্ভুত বৈষ্ণবদর্শনের সূক্ষ্মদৃষ্টি, লীলাস্থলীর স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা সবার কাছে গৌরের সন্ধান জিজ্ঞাসা ক'রে ফিরছেন। এবার বালকের ন্যায় রোদন আর অর্দ্ধস্ফুট বাক্যোচ্চারণ। কণ্ঠ জড়িত আর পিচকারী ধারার মত অশ্রুবেগ। এ অশ্রুনির্ঝর কার জন্য ? তাঁর নিজের জন্য নিশ্চয় নয়। এ যে আমাদের চিরঅবরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে স্ফুরণের অব্যর্থ রীতি। গৌর তাঁর একান্ত নিজজন না হলে

পণ্ডিত কহে যাহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটী সেবা তৎপদ দর্শন॥

গদাধর পণ্ডিত কিছুতেই ফিরবেন না, আর মহাপ্রভুও ছাড়বেন না। প্রভু নানাভাবে যখন কোনরকমেই এঁটে উঠতে পারলেন না তখন ব'ললেন—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

এরপর আর কোন কথা চলে না। পণ্ডিত ভূমিতলে মূর্চ্ছিত। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে পণ্ডিতের সাথে নীলাচলে ফিরে যেতে আদেশ ক'রে নৌকায় চাপলেন। একে একে বিদায়ের পালা। যাজপুর এসে সঙ্গে যে দু'জন রাজপাত্র ছিলেন তাদের বিদায় দিলেন। এভাবে রেমুনায় এসে রামনন্দরায়কেও বিদায় দেবার ইঙ্গিত হ'ল—

ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে ক'রে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

পথে যেতে মহাপ্রভু কত কতই না লীলা প্রকাশ ক'রছেন। ক্রমে উড়িষ্যার সীমার কাছে এক রাজ্যে এসে হাজির হ'লেন। অগ্রবর্ত্তী পথে দুর্দ্দান্ত এক মদ্যপ যবনের অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বত্র জ্ঞাত। তার অধিকার পিছলদা পর্য্যন্ত। তার ভয়ে কেউ নদী

পার হ'তে পারে না। এদিকে তত্রত্য রাজঅধিকারী প্রভুকে কি ক'রে নিরাপদে নদী পার করাবেন এ চিন্তায় পড়লেন।

ইত্যবসরে যবনের অনুচর হিন্দুবেশ ধারণ ক'রে প্রভুকে দর্শন করে যান ও সব বৃত্তান্ত তাঁকে জানান—"জগন্নাথ থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। কষিতকাঞ্চন জিনি তাঁর বর্ণ। উন্নত সুন্দর সুঠাম দেহ, ভাবভরে আঁখিদুটি ঢুলু ঢুলু। সঙ্গীরা সব সিদ্ধ পুরুষ! তাঁরা নিরন্তর কৃষ্ণ গুণগান করছেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁদের দর্শন ক'রতে এসে পাগলের মত কেবলই কৃষ্ণ কৃষ্ণ গান ক'রে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অনুচরটিও "হরিকৃষ্ণ" নাম উন্মত্তের মত গান ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। এ বর্ণনা শ্রবণে যবন অধিকারীর মন ফিরে গেল। প্রভুর দর্শন লালসায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। এক দূত পাঠিয়ে ওড়িয়া অধীপকে জানালেন প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষার কথা।

সংবাদ শ্রবণে ওড়িয়া অধীপ প্রভুর জগৎ উদ্ধারণ লীলার জয়জয়কার দিতে আরম্ভ ক'রলেন। আর দূতকে জানালেন—তিনি এখানে এসে মহাপ্রভুকে অনায়াসে দর্শন ক'রে যেতে পারেন—যদি বিশ্বাস হয় তবে সঙ্গে পাঁচ সাতজন নিরস্ত্র ভৃত্য নিয়ে আসবেন। মদ্যপ যবনঅধীপ সর্ত্তমত প্রভু দর্শনে এলেন। দূরদর্শনে প্রভুকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম বন্দনা জানালেন। নয়ন জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে আর বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ ক'রছেন। প্রভু দর্শনে তাঁর আত্মগ্লানিসূচক খেদোক্তি পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রব করে। প্রভু তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি সঞ্চার ক'রলেন। যবন আজ মহাপ্রভু দর্শনে দিব্যলোকের সত্যানুসন্ধী দৃষ্টিতে

চক্ষুষ্মান। তাঁর প্রাণে ইচ্ছা জাগল প্রভুর কিছু সেবা করার। তখন মুকুন্দ দত্ত জানালেন—প্রভুর গঙ্গাতীর যেতে ইচ্ছা হ'য়েছে তুমি যদি এ বিষয়ে সহায় হও তবে বড় উপকার হয়।

তখন সেই যবনরাজ প্রায় দশ নৌকা ভর্ত্তি সৈন্যসহ একটি নৌকায় প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নদী পার করিয়ে পিছলদা পর্য্যন্ত এলেন। এখান থেকে প্রভু তাঁকে বিদায় দিলেন। সে বিদায় কাহিনী মর্ম্মের অন্তস্তলে এক নিবিড় আলোড়ন তোলে।

"সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপাশাটি॥
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পানিহাটি গ্রামে আগমন কাহিনীটি সেই পুরুষপ্রবর দিব্য সুরের মোহনীয় ছন্দে সমবেত জনতাকে পরিবেশন করতে থাকলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীর্ত্তনে আখর চলছে—

আজ সেই দিনরে—
প্রাণ গৌর আইলা পানিহাটিতে,
আজ সেই দিনরে।
এসেছি আশা করে মনে।
(তোমার) ত্রিকাল সত্য লীলা জেনে,
এইত আগমন কাল জেনে,
দেখতে পাব গোরা ধনে,
(তাই) এসেছি আশা ক'রে মনে।

—হা প্রাণগোর গুণমণি! নিশ্চয় এসেছ তুমি! তুমি এসেছিলে এইখানে। এইদিনে নিজগণ সনে! তোমার রাঘবেরে দেখা দিতে, তুমি এসেছিলে এইখানে। এই গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষতলে, ক'রেছ তুমি অবতরণ! আজ তোমার আসবার দিন! একবার দেখা দাও! আমরা বড় অভাগা জেনে, দেখা দাও নিজ গুণে! এই ত সেই লীলাস্থলী! এই তরু রয়েছে সাক্ষী!

এভাবে করছেন কত আকুতিভরা আবেদন নিবেদন, সুরে সুরে আখ্যাপন। কখনও মিনতির করুণ আবেদন, আবার কখনও বা দৃপ্ত অভিমান। গৌরগণের উদ্দেশ্যে জানালেন—তোমাদের গৌর তোমরা না দেখালে আমাদের দেখবার কি অধিকার আছে? তোমরা নিজগুণে আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে একবার দেখাও। এ স্বরে মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ প্রকাশ পেতে থাকে। তারপর আবার বলছেন—

কোথা বা যাব রে!
কে সন্ধান বলে দেবে,
কোথা বা যাব রে!

অদ্ভুত পুরুষপ্রবরের লীলানুস্মৃতি। স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা সকলের কাছে গৌর সন্ধান জিজ্ঞাসা করছেন। আর নয়ন জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কার না হৃদয়ে প্রত্যক্ষ লীলানুভূতির দোলা জাগবে? নিজের আর্ত্তি ও করুণ সুরের জালে সমবেত জনতার হৃদয়তন্ত্রীকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই সকলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলই কাঁদছে। অতি বড় পাষাণ্ডও আজ বিস্ময় বিহ্বল। এবার জাহ্নবীকে উদ্দেশ করে কীর্ত্তন ধরলেন—

বল বল ওগো সুরধুনি,
কোথা প্রাণ গোরা গুণমণি।
বলে দে বলে দে!
ও গৌর গরবিনী সুরধুনি
বলে দে বলে দে!
তোমার তীরে এই পানিহাটিতে,
কোথা প্রাণ গৌর বিহরিছে!
কৈ কথা যে কৈছ না!
কে গৌর সন্ধান ব'লে দেবে!
আর কারে বা শুধাব!

বিশাল জনসমুদ্র এমন নিস্পন্দ যে, নদীর কলতান পর্য্যন্ত শ্রুত হয়। মনে হচ্ছে নদীর কলতানের তালে তালেই যেন পুরুষপ্রবরের কণ্ঠের আদান প্রদান চলেছে। নানাভাবে সুরধুনিকে গৌর-সন্ধান জিজ্ঞাসা করে এবার তিনি বটবৃক্ষরাজকে উদ্দেশ করে বলছেন—

বল বল ওগো তরুরাজ,
কোথা প্রাণ গোরা নটরাজ।
কোথা গেলে গৌর দেখতে পাব,
তরুবর বল বল।
তুমিত দেখেছ,
একবার দেখাও মোরে!
কোন কথা যে কৈলে না,
আর কার কাছে যাব?

গৌর সন্ধান জানিতে
আর কার কাছে যাব ?

বৃক্ষরাজকে লক্ষ্য করে পুরুষপ্রবরের মিনতি ভরা আবেদন একটি মাধুর্য্যঘন পরিবেশের অবতারণা করেছে। এই নিঃশব্দ আসরে পবনও যেন তার গতিবেগ সংযত করেছে। বটবৃক্ষরাজ যেন স্বভাবগম্ভীর আবেশে গৌরসন্ধানের ভাবনায় নিথর। এবার পানিহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে জানালেন—

বল বল পানিহাটিবাসী,
কোথা চিতচোরা গোরাশশী।
তোমরা পদাঙ্কিত ভূমি নিবাসী—
তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি,
বলে দাও গো দয়া করে!
(কৈ !) কেহ ত কথা কৈছ না ?

কি অপূর্ব্ব আর্ত্তি! বিনিয়ে বিনিয়ে তিনি সুরধুনি, বট-বৃক্ষরাজ ও পানিহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে কত কথাই না জানালেন। এ আকুতিভরা আবেদনে কার না হৃদয় স্পর্শ করবে ? এ যে প্রেমরাজ্যের অমোঘ রীতি। কাকেও বাদ দিয়ে কেউ নয়। অদ্ভুত বৈষ্ণবদর্শনের সূক্ষ্মদৃষ্টি, লীলাস্থলীর স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা সবার কাছে গৌরের সন্ধান জিজ্ঞাসা ক'রে ফিরছেন। এবার বালকের ন্যায় রোদন আর অর্দ্ধস্ফুট বাক্যোচ্চারণ। কণ্ঠ জড়িত আর পিচকারী ধারার মত অশ্রুবেগ। এ অশ্রুনির্ঝর কার জন্য ? তাঁর নিজের জন্য নিশ্চয় নয়। এ যে আমাদের চিরঅবরুদ্ধ হৃদয়া-বেগকে স্ফুরণের অব্যর্থ রীতি। গৌর তাঁর একান্ত নিজজন না হলে

কার জন্য এ আর্ত্তি! সংসার জীবনে আমরা মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ থেকে যাদের নিজজন ব'লে কাঁদি সে আর্ত্তিরও বিরাম আছে। এ যে চিরসম্বন্ধযুক্ত! তাই এ চিরআর্ত্তিময় মনোরমণ। পুরুষ-প্রবরের এ আর্ত্তিময় ক্রন্দন মূর্ত্তির মধ্যে কত সৌন্দর্য্য। মনে হয় কেবল দেখি—আরও দেখি। তবুও আশা মেটে না। কাঁদার মধ্যে এত সৌন্দর্য্য, এত রূপ, এত সুষমা, এত ভালবাসা আমি কখনও দেখিনি। সংসারে যারা আমার ব'লে কাঁদে (যারা প্রকৃতপক্ষে আমার নয়) সে কাঁদায় মন বিষিয়ে ওঠে। বিরক্ত হই, যেন চোখের আড়াল ক'রলে বাঁচি। কিন্তু এ কি অপরূপ? তাই না বলে! সব জিনিষই সুন্দর—যদি সেটি সত্যকার প্রেমমাখা হয়।

এবার তাঁর শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন—তবে কার কাছে যাব? এ জগমাঝে আর কে আছে! আমাদের ব্যাথার ব্যথী, এ জগমাঝে আর কে আছে! ওগো আমার ব্যথার ব্যথী! ওগো আমার দরদী! দেখাবে ব'লে বলেছিলে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে! (প্রাণ) নিতাই গৌর ল'য়ে, লুকাইয়ে ক'রছ খেলা! ত্রিকাল সত্যলীলায় তুমিও ত সঙ্গে এসেছ! একবার দেখতে সাধ। ওহে আমার প্রাণের ঠাকুর! প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও! কোথা গেলে দেখ্‌তে পাব? প্রাণে প্রাণে ব'লে দাও।

এবার যেন সাড়া পেয়েছেন। তাই বলছেন, কে যেন ব'লছে প্রাণে প্রাণে! প্রাণ গৌর আছে রাঘব ভবনে!

"চল যাই সবে মিলে রাঘবের ঘরে।
প্রাণ গৌর বিহরিছে দেখব নয়ন ভরে॥"

এই কীর্ত্তনের ধূয়া ধ'রে বটবৃক্ষমূলের সমগ্র জনতা সমেত তিনি রওনা দিলেন রাঘব ভবনের দিকে। খোল করতালের ছন্দে ছন্দে অসংখ্য জনগণের মাঝে চ'লেছেন যেন প্রেমমদিরা পানে প্রমত্ত মাতাল। আর্ত্তিভরা নয়নদুটী ঢুলু ঢুলু, দেহ মন ভাবে মাতোয়ারা। রাঘবের বাড়ীর মাধবীকুঞ্জে কীর্ত্তন ধ'রলেন—

লোক মুখে পেলাম পরিচয়,
এই ত রাঘব পণ্ডিতের আলয়॥
রাঘব পণ্ডিত কোথায় তুমি!
এই ত তোমার বসতভূমি॥

—পরম করুণ শ্রীগুরুদেব! প্রাণে প্রাণে জানালেন মোদের! প্রাণ গৌর এসেছেন তোমার ঘরে। ত্রিকাল সত্যলীলায় এই পানিহাটিতে। প্রাণ গৌর এসেছেন তোমার ঘরে! এসেছেন নিশ্চয়ই তোমার ঘরে! এই মাধবী লতার কুঞ্জে, (আজ) সেই চিতচোরচূড়ামণিরে, একবার দেখাও মোদের!

—রাঘব পণ্ডিতের কাছে কত দরদভরা প্রাণঢালা প্রার্থনা— "আমরা শ্রীগুরু মুখে শুনেছি যে শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখে ব'লেছেন —শচীমায়ের রন্ধনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, নিত্যানন্দ নর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে এই চারি জায়গায় আমি সর্ব্বদা থাকি।" ত্রিকাল-সত্যলীলায় আজও গৌরসুন্দর তোমার ঘরে নিশ্চয় বিহার করছেন। এত লোক তোমার গৌরেরই অলক্ষ্য আকর্ষণে এসেছে, তাদের ফিরিয়ে দিও না। তোমার গৌর তুমি যদি না দেখাও, কে দেখাবে? গৌরাঙ্গদাস উদার ব'লে জনমাঝে প্রচার। যদি তাদের এভাবে ফিরিয়ে দাও তবে গৌরাঙ্গ-দাস এ নামে যে কলঙ্ক হবে।

কতভাবের প্রার্থনা ভাষায় আর বর্ণনা করা যায় না। তারপর বলছেন—

কে যেন ব'লছে প্রাণে প্রাণে।
যাও যাও শ্রীরাঘব মন্দিরে॥
প্রাণ গৌর সেথা বিহরে—
যাও যাও শ্রীরাঘব মন্দিরে।
"চল শ্রীমন্দিরে যাই!"

"দেখিব শ্রীচৈতন্য গোঁসাই! চল শ্রীমন্দিরে যাই।" এই নামের ধূয়া ধ'রে হাজির হলেন অদূরবর্ত্তী রাঘব পণ্ডিত সেবিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম বিগ্রহের সম্মুখে। পরিবেশই মানুষকে পৌঁছে দেয় তার আশাতীত লক্ষ্যস্থলে। আজ সকলেই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে মাধুর্য্যের লাবণ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এবার কীর্ত্তন ধ'রলেন—

প্রাণ গৌর দেখতে এলাম পানিহাটি গ্রামে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তা না পাইনু সন্ধানে॥
কে যেন বলিয়া দিল মোর প্রাণে প্রাণে।
প্রাণ গৌর বিহরে শ্রীরাঘব ভবনে॥
অপরূপ দেখলাম আসি
শ্রীরাঘবের ঘরে।
রাধাশ্যাম রূপ ধ'রে
শ্রীগৌরাঙ্গ বিহরে॥
অকস্মাৎ দেখতে পেলাম,
নাই মুরতি রাধাশ্যাম।
গৌররূপে বিহরে একঠাম।

—'দেখলাম প্রাণ গৌর বিহরে! দেখলাম এক নব মূরতি! দুই মূরতি মিশামিশি, নিত্যানন্দ গৌরহরি! নিতাই গৌর জড়াজড়ি রূপে, বিলসে রাঘবের ঘরে! নিতাইরাধা-গৌরশ্যাম। শ্রীগুরু আগেতে দেখলাম! অপরূপ রূপঠাম! দোঁহে হয় দোঁহার প্রাণ। নিতাই রাধা গৌর শ্যাম ॥' এ সময়ে সকলের প্রাণে নিতাইজড়িত এক অপরূপ গৌরমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি জেগেছে। এবার বুঝি গৌর দেখতে পাব। এমন গৌরের আমরা নাম শুনিনি। এ মহাপুরুষেরই সাধনোত্থিত অনুভবের পরম উৎকর্ষময় চরম ভোগ্যনিধি।

আকুল আগ্রহে চেয়ে আছি তাঁর দৃষ্টির দিকে। সে দৃষ্টির কিরণ যেন সকলের মানস নয়নে উছলে পড়ছে। এবার "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামসহ আবার ফিরে আসা হ'ল বটবৃক্ষমূলে। প্রণাম বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর হাজির হলেন তদীয় সতীর্থ শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্য-সরস্বতী মহাশয়ের বাড়ীতে, সেখানে বিশ্রাম করে আবার আশ্রমের দিকে রওনা দিলেন। যিনি আজ আমাদের কল্পনার অতীত লীলানু-ধ্যানে ডুবিয়ে দিয়েছেন আবেগময় কীর্ত্তনের স্বরে সে পুরুষ আর কেউ নয়, ভারত তথা বাংলার প্রখ্যাত বৈষ্ণবগুরু শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ।

এ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত উৎসবের সামান্য কিছু আলোচনা ক'রে কাহিনীর উপসংহার ক'রব। জ্যৈষ্ঠমাসে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসবটিই পানিহাটিতে বরাবর অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আগমন-তিথি ধ'রে কোন উৎসবের প্রচলন

ছিল না। আনুমানিক ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তদীয় গুরুদেব শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপানু-প্রেরণায় ও পানিহাটিবাসী স্বনামধন্য শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সাহচর্য্যে এ উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর দিব্য সুরমাধুর্য্যে ও ভাবব্যঞ্জনায় তদানীন্তন জনসাধারণ ও বৈষ্ণব সমাজে এই লীলানুস্মৃতির অনুপ্রেরণা জাগে। বর্ত্তমানে এ উৎসবে রীতিমত মেলা বসে। উৎসবের অনুষ্ঠান ও দৃঢ়মূল স্থায়িত্ব সম্পর্কে বাবাজী মহারাজের দরদ ঢালা প্রাণময় অবদান মানুষ চিরদিন অবনত মস্তকে স্বীকার ক'রবে। বাবাজী মহারাজের এমনই প্রভাব ছিল যে, কোন জায়গায় সামান্য কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে গেলেই হাজার হাজার লোকের সমাগম হ'ত। তার মানে ছোটখাট একটি মেলা। এ অনুষ্ঠান বৈষ্ণবকৃষ্টিতে কত বড় প্রভাব বিস্তার ক'রেছে তা অনুমান করা যায় না।

দাস রঘুনাথের দণ্ড-মহোৎসব

অনেক দিন আগের কথা। সঠিক তারিখ বা বৎসরটি ঠিক স্মরণ নেই। তবে মাসটি ছিল জ্যৈষ্ঠ। যাত্রীবাহী নৌকাটিতে বহু নরনারীর ভীড়। এদের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়সে সবচেয়ে কনিষ্ঠ। সবাই আমরা শুনতে যাচ্ছি—পানিহাটিতে 'দণ্ডমহোৎসব' কীর্ত্তন। এর পূর্ব্বে আর একবার সেখানে গিয়েছিলাম কার্ত্তিক মাসে। তখন ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব।

পানিহাটিতে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত মনের মধ্যে চ'লছে নানা প্রশ্নের দোলা। ভাবছি, "দণ্ডমহোৎসব" আবার কি? মহোৎসব তো জানি আনন্দেরই হয়। নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে, যেটি শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের মধুময় পরিবেশনে বুঝতে সক্ষম হব।

গঙ্গায় তখন ভরা জোয়ার, কানায় কানায় জল। দিনটি রবিবার থাকায় নদীর উভয় দিকের কলকারখানাগুলি বন্ধ। তাই জনতা বা শব্দ-কোলাহল নাই। মৃদু মন্দ পবন ব'য়ে চ'লেছে স্রোতেরই অনুকূলে। গন্তব্যস্থানের প্রায় কাছাকাছি নৌকা এসে গিয়েছে। এমনি সময়ে কাণে ভেসে এল বাবাজী মহারাজের চিরপরিচিত মধুস্রাবী একক কণ্ঠস্বর। পরক্ষণেই শোনা গেল, সমবেত কণ্ঠে বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের প্রতিধ্বনি। খোলের গুরু-গুরু ধ্বনিতে মনে করিয়ে দেয় মেঘের গর্জ্জন।

নৌকা ঘাটে লাগানো মাত্র ত্বরিত পদে পৌঁছলাম কীর্ত্তন স্থলে। অসম্ভব ভীড়। ভেতরে প্রবেশ করার আশা বৃথা। তবু—ছেলেমানুষ আমি, এইটাই ছিল ভরসা। সুবিধামত ভীড়ের ভিতর দু-চার জায়গায় একটু মাথা গলাবার চেষ্টা করামাত্র এক ভদ্রমহোদয় স্নেহভরে আমায় সামনের দিকে টেনে নিলেন। কিন্তু পাশের একটি কীর্ত্তনতন্ময় শ্রোতা কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'ললেন—তুমি আবার কি বুঝবে হে! কেন শুধু শুধু এর ভিতর ঠেলে ঢুকছো!

মনে মনে ভাবলাম, তিনি ঠিকই ব'লেছেন। সত্যিই আমি কি বুঝি? ভেবে পাই না তবু কেন এত আগ্রহ! কেন এমন করে ছুটে আসা! এরপর থেকে প্রতি বৎসরই এসেছি দুবার ক'রে, যথাক্রমে কার্ত্তিক ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। একমাত্র আকর্ষণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন। কেন? একবার শুন্‌লেই তো বিষয়-বস্তুটা জানা যায়। তবু বারে বারে কেন আসা?

সহস্র সহস্র নিবিষ্ট শ্রোতার মাঝে বসে আছি। চোখের কোন্‌ বেয়ে হঠাৎ নেমে এল দু'ফোঁটা জল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেললাম। এ কি? আমি কাঁদছি কেন? বাবাজী মহারাজের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে যেন এক কচি শিশুর উচ্চ ক্রন্দন-ধ্বনি। সে ক্রন্দনের মধ্যে কত আন্তরিকতা! মুখাবয়বে শিশু-সুলভ ক্রন্দনের ছবিটিও অবিকল ফুটে উঠেছে। সে ক্রন্দনের মধ্যে এক অপার্থিব ভালবাসারই যেন ইঙ্গিত রয়েছে। আহা! কি অপূর্ব্বই না সে দর্শন ও শ্রবণ। জীবন সার্থক হয়ে গেল।

অপলকে চেয়ে আছি, আর কীর্ত্তনের ভাষা কাণে প্রবেশ করছে যেন একটি জীবন্ত রূপ নিয়ে।

বাবাজী মহারাজের মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত। ভাবগদগদ কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর প্রাণমাতান কীর্ত্তন—

বিরলে নিতাই লইয়া হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
দুটী হাতে ধ'রে তাঁর কে'দে ব'লছেন প্রভু,
—ও নিতাই আমার কথা রাখ।
(নিতাই !) তুমি ত আমার একমাত্র সহায়।
জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥

—সচল জগন্নাথ, নীলাচল-বিহারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও নদীয়ার পার্ষদগণ সমভিব্যবহারে শ্রীধাম পুরীতে অবস্থান ক'রছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে প্রভু এখানে উপস্থিত হ'লে একে একে মরমী পার্ষদগণ সব এসে জড় হ'লেন। প্রভুকে ঘিরে আনন্দের নব নব উন্মেষে কত নব নব লীলাবৈভব তখন প্রকাশ পাচ্ছে। এ তরঙ্গে সকলেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। কে চায় এ আনন্দ-রঙ্গ থেকে বিদায় নিতে!

দিনের পর দিন এভাবে অতিবাহিত হয়ে চ'লেছে, কারো কোন দিকে ভ্রুক্ষেপই নাই। প্রভু বড় চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। এঁরা যদি এভাবে এখানেই অবস্থান করে তবে পতিত ও তাপিতের দুয়ারে দুয়ারে কে আর হরিনামসুধা বিলাবে? তাই একদিন নিভৃতে ব'সে নিতাইচাঁদের দুটী হাতে ধরে তিনি ব'লছেন—

'প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড় দেশে যাও॥'

নিতাইচাঁদের প্রতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মিনতিভরা এই নিবেদনের দৃশ্যটির অবতারণা করার পর বাবাজী মহারাজের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে কি অপূর্ব্ব ভাবময় পদাবলী, আর অনবদ্য আখরপুঞ্জ—

জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
কহে প্রভু নিত্যানন্দ, সব জীব হইল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
(নিতাই) এই নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥

যত পাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি রয়
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিকগণ পড়ুয়া অধমগণ
তারা জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
প্রেমধন দান করি বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
জীবের দরিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে—
হউক না কেন ধনী মানী কুলীন,
যার নাই কৃষ্ণ প্রেমধন
এই জগমাঝে সেই দরিদ্র।
সেধে যেচে নাম প্রেম দিয়ে
দরিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে।
(নাম) সংকীর্ত্তন প্রেম রসে ভাসাইয়া সব দেশে
পূর্ণ কর সবাকার আশ,
যাও যাও নিতাই ত্বরা করি !
আমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর,
নাম প্রেম দিয়ে বিশ্ব ভর !
বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর।

একেই নিতাইচাঁদ জীবের দুঃখে বিগলিত, স্বভাবকরুণ। তার ওপর আবার পেয়েছেন আজ্ঞা। আর রক্ষা নাই। গৌর-প্রেম মদিরাপানে প্রমত্ত হ'য়ে নিতাইচাঁদ দুবাহু উর্দ্ধে তুলে উদ্দণ্ড

নর্ত্তন আরম্ভ করলেন। ক্ষণে ক্ষণে মেঘগর্জ্জন জিনি হুঙ্কার। আবার উল্লাসভরা অট্টহাসি, সামনে যাকে পাচ্ছেন বাহুর আলিঙ্গন পাশে বেঁধে ফেলছেন। সে অমনি প্রেমভরে ঢলে প'ড়ছে।

এবার শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর গৌড়দেশের ভক্তসাথে যাত্রা ক'রলেন গৌড়াভিমুখে। নয়নপথে তাঁর যে-ই পড়ছে সপ্রেমে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ব'লছেন—বল! একবার আমার গৌর বল! তোদের পায়ে পড়ি, হাতে ধরি, একবার বদনভরে গৌর বল। "তোদের পাপের বোঝা নিব। বিনামূলে বিকাইব, একবার বদন ভরে বলরে হরিনাম।"—ম্লেচ্ছ যবন কোন বিচার নাই। শূদ্র ব্রাহ্মণে কোন ব্যবধান নাই। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই স্বরূপ জাগানো মুরতির সাথে স্বরূপে স্বরূপে দেখা হ'চ্ছে—তাই নয়নের কোণ ঠেলে বেরিয়ে আসছে পুলকাশ্রুর ধারা। আপনা থেকে উচ্চারিত হ'চ্ছে হরিনাম। এই বর্ণনাকে উপলক্ষ ক'রে কীর্ত্তন চ'লছে—

গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া
নিতাই বিদায় হইয়া
চলিলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
(স্বভাবকরুণ নিতাইচাঁদের
আনন্দ আর ধরে না।
একে সহজেই জীবের দুঃখে দুঃখী,
তাতে পেয়েছেন গৌর আজ্ঞা
অবিচারে নাম প্রেম বিলাতে।

(তাতে পেয়েছেন গৌর আজ্ঞা)

চলিলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পথে চলে যেতে কত না নব নব লীলা প্রকাশ পাচ্ছে। নিত্যানন্দের পরমভক্ত রামদাসের দেহে গোপাল ভাবের আবেশ প্রকাশ হ'ল। তিনি হঠাৎ মধ্য পথে প্রায় তিন প্রহর ব্যাপিয়া ত্রিভঙ্গ হ'য়ে রইলেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গোপীভাবে গদাধর দাস "দধি কে নিবি গো" বলে ফিরছেন। আবার কেউ বা গোপালভাবে সর্ব্বক্ষণ হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছেন।

নিত্যসিদ্ধ গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ যে যার ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে পড়ছেন। পথ বা বিপথ জ্ঞান নাই। উন্মত্তের মত চ'লেছেন। পথ ছেড়ে অন্যদিকে দু চার ক্রোশ এগিয়ে গিয়ে কাকেও জিজ্ঞাসা ক'রছেন গঙ্গাতীরে যাবেন কোন পথে? আবার ঠিক পথে কিছু-দূর যান। কিছুকাল বাদে পুনরায় ভিন্ন পথে এগিয়ে চলেন বহুদূর। কারো দেহে অবসন্নতা নাই, জড়তা নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, দুঃখ ইত্যাদির কোন বোধই নাই।

বাবাজী মহারাজের বর্ণনাভঙ্গির বৈচিত্র্যে ঐ লীলা প্রত্যক্ষের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। খোলের বোলের সঙ্গে নিতাইতরঙ্গের দোলটি তিনি জাগিয়ে তুলেছেন গণচিত্তে। বিশাল জনতা তন্ময় হয়ে শুনছে প্রেমদাতা কারুণ্যঘন শ্রীনিতাইচাঁদের পতিতপাবন লীলা। সুমধুর কীর্ত্তন চ'লছে—

"গজেন্দ্র গমনে যায়, সকরুণ দিঠে চায়"

গৌর প্রেম-মদিরা পান করি

যায়রে নিতাই মাতা করী,
যায় বাহু-শুণ্ড দোলাইয়া
(নিতাই করী) পাষণ্ডকদলী দ'লবে ব'লে
—যায় বাহুশুণ্ড দোলাইয়া।
প্রেমিক নিতাই প্রেম-দিঠে
যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়।
স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতা
যার পানে চায় প্রেমে মাতায়।
"পদ ভরে মহী টলমলরে"।
(আমার) নিতাইচাঁদের পদ ভার
ধরণী আর ধরতে নারে।
বড় ভাগ্যবতী ধরণী—
আনন্দ আর ধরে নারে।
আজ ধরণীধরে হৃদে ধ'রে
ধরণীর আনন্দ আর ধরে নারে।
ধরণী প্রেমে টলমল করে—
গৌর-প্রেমের-মূরতি নিতাই হৃদে ধ'রে
ধরণী প্রেমে টলমল করে।
(শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের মূরতি রাধা)
(গৌর প্রেমের মূরতি নিতাই)
(সেই রাইকানু মিলিত গৌর)
(সেই) গৌর-প্রেমের-মূরতি নিতাই হৃদে ধরে—
ধরণী প্রেমে টলমল করে।

"পদভরে মহী টলমলরে।"
গতি মত্ত সিংহজিনি, কম্পমান মেদিনী,
পাষণ্ডীগণ হেরিয়া বিকল রে॥
আমার পাষণ্ডদলন নিতাই হেরে
তাদের পাষণ্ড স্বভাব দূরে গেল রে।
আজ পাষণ্ডী পাষণ্ড স্বভাব ভুলে
নিতাইচাঁদকে দেখে বলে—
(বলে) "আওত অবধূত করুণার সিন্ধু রে।"
ঐ পতিতের বন্ধু নিতাই, হেলে দুলে নেচে আসছে।
আমরা হইনা কেন মহাপতিত
আর আমাদের ভয় কি আছে।
ঐ যে পতিতের বন্ধু নিতাই এল,
আর পতিতের ভয় কি বল!
পাষণ্ডীগণ প্রেমদৃষ্টি পেয়ে বলে—
একবার—চেয়ে দেখ ভাইরে আমার!
কি মধুর মূরতি!
"দেখরে নয়ন ভরি ঐ নিতাই সুন্দর রে"।
গৌরাঙ্গ প্রণয় রসময় পুরন্দর রে॥
গোরা রসে গঠিত ঐ নিতাই—কলেবর রে।
গোরা-রস-কমলের মত্ত মধুকর রে॥
গোরা-রস-চাঁদের-চকোর নিত্যানন্দ রে।
জীবহৃদি তমঃ বিনাশের পূর্ণতম চন্দ্র রে॥
জগতগুরু নিত্যানন্দ, হৃদি তমঃ বিনাশের পূর্ণচন্দ্র—

(বলে) "আওত অবধূত করুণার সিন্ধু রে ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে নিতাইচাঁদ সেদিন আত্মহারা হয়েছেন। হরিনাম সুধা আচণ্ডালে বিলাতে বিলাতে জৈষ্ঠ্যমাস শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এসে পৌঁছলেন তিনি পানিহাটিতে—

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকলি অনন্ত ॥
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম ॥

শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পানিহাটির গঙ্গাতীরে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর উদাস ভাবাবেশ, সুন্দর স্ফুরিত হাসি, উন্নত পরিসর বক্ষ, দীর্ঘাকৃতি, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ও কমনীয় রূপের কথা লোকমুখে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে প'ড়ল। এ সংবাদ সপ্তগ্রাম অধিপতির পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীরও কর্ণগোচর হ'ল। তিনি নিতান্ত বিষয়-বিরক্ত হয়ে কালাতিপাত ক'রছিলেন। নিরাশার গাঢ় ধূম্রজাল তাঁর হৃদয়াকাশ ক'রে রেখেছিল আচ্ছন্ন। এবার সে জাল ভেদ ক'রে আশার ক্ষীণ আলো দেখা গেল। তিনি পানিহাটির পথে যাত্রা ক'রলেন।

রঘুনাথ গঙ্গাতীরে সপার্ষদ নিত্যানন্দের দর্শন পেলেন। বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রভু বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর ব'সে আছেন। রঘুনাথ প্রভুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও অপ্রতিহত প্রভাব দেখে বিস্ময়বিমূঢ়। দূর থেকে ভূতলশায়ী হ'য়ে তাঁর উদ্দেশে দণ্ডবৎ

প্রণাম জানালেন। এমনি সময় কোন এক ভক্ত রঘুনাথের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করামাত্র তিনি তাঁকে ক'রলেন 'চোরা' বলে সম্বোধন—

"শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় চোরা তোরে করিব দণ্ডন॥
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিল চরণ॥

—এ লীলা প্রসঙ্গটীর উল্লেখ ক'রে বাবাজী মহারাজ তাঁর হৃদয়ের দিব্য অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুললেন আখরের ঐশ্বর্য্য ও সরসতায়।

নিতাইচাঁদ কেন রঘুনাথকে চোর বলে সম্বোধন ক'রলেন? কেন, তিনি প্রভুর কি চুরি ক'রেছেন? বাবাজী মহারাজ এখানে আবিষ্ট হ'য়ে ব'লে যাচ্ছেন—এ যে ভাই বড় ভেতরের কথা। রঘুনাথ গৌরসুন্দরের দর্শনলাভের জন্য শান্তিপুরে গেছলেন দু'বার, কিন্তু তাঁর দর্শন মেলেনি, অলক্ষ্যে থেকে সান্ত্বনা বাক্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন—

"স্থির হও রঘুনাথ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥

তদবধি মহাভক্ত রঘুনাথের হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল অনুতাপানলে। ভেবে মরছিলেন, কেন দর্শনলাভ হ'ল না?

এখানে বাবাজী মহারাজ ব'লছেন—নিতাইচাঁদের সর্ব্বস্বধন

যে শ্রীগোর সুন্দর ! রঘুনাথ তা চুরি করতে গিয়েছিলেন। যাঁর ধন তাঁকে না জানায়ে, তিনি চুরি ক'রতে গিয়েছিলেন। যাঁর ধন তাঁকে না ব'লে নিলে, তা যে চুরি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার নিতাইচাঁদ তাই রঘুনাথকে চোর সম্বোধন ক'রলেন। নিতাই-চাঁদের বিনা আনুগত্যে পরমবস্তু ভোগ ক'রতে গিয়েছিলেন, তাই প্রভু তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দু'বার। জগতকে দেখালেন—যতই হোক বড় অধিকারী, আমায় তো কেউ পায় না—নিতাইর আনুগত্য বিনা !

ভাবরাজ্যের এ নিগূঢ় তত্ত্ব, মরমী সাধকের এ বুকের ভাষা এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বাবাজী মহারাজের মনোরম ব্যাখ্যায় তা এক অনবদ্য রূপায়নে প্রকাশ পেল।

রঘুনাথ প্রভুর চরণ দুটি বক্ষে ধারণ ক'রে কাঁদতে থাকলেন। কতদিনে তাঁর প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হবে, ব্যাকুল হয়ে এই প্রশ্ন তিনি জান্‌তে চাইছেন। স্বভাব করুণ নিতাইচাঁদ সদয় হলেন—

"নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি—দণ্ডিব তোমারে ॥
চিড়াদধি ভালমতে খাওয়াও মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথের মনে ॥"

রঘুনাথের মনে আজ আনন্দের অন্ত নেই। অদ্ভুত প্রভুর এ কৃপাদণ্ড। নিজ গ্রামে লোকজন পাঠিয়ে চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন ক'রলেন, ভারে

ভারে আস্‌তে থাকলো নানাবিধ মিষ্টান্ন। প্রান্তর ও বৃক্ষতল ভরে উঠল লক্ষ লোকের সমাগমে।

প্রভুর নির্দ্দেশে চিড়া, দধি, দুগ্ধ, কলা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বৃহৎ মাটির কুণ্ডায় পৃথক পৃথক রাখা হ'ল। তারপর উক্ত দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শ্রীমালা ভোগের ব্যবস্থা হ'ল—যাকে আমরা বর্ত্তমানে বলে থাকি মালসা ভোগ।

স্থানীয় ভক্ত ও ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ এই আনন্দোৎসবে যোগদান ক'রলেন। আবালবৃদ্ধ নরনারী সেখানে সমবেত।

এই অপূর্ব্ব ভাবগম্ভীর উৎসব ক্ষেত্রে নিতাই সুন্দরের সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ সাতটি মৃৎকুণ্ডিকায় চিড়া দধি দুগ্ধ সমাহারে রক্ষিত হ'ল। প্রত্যেককে দুই হোলনা (মাটির মালসা) ক'রে একটিতে দধি চিড়া অপরটিতে দুগ্ধ চিড়া দেওয়া হ'ল, সকলেই এ আনন্দ-রঙ্গের নূতনত্বে খুবই উৎসাহিত। চিড়া ভোগ উৎসবের কথা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীর জনারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। এত লোক সংঘট্ট হ'ল যে অনেকে তীরে স্থান না পেয়ে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে চিড়া ভোগ গ্রহণ ক'রলেন। পশারির কাছ থেকে ক্রীত দ্রব্যের চিড়াভোগ পশারিকেই খাওয়ান হ'চ্ছে। ভক্তিরসে আত্মহারা এ এক অপূর্ব্ব পরিবেশ!

এমনি সময় রাঘব পণ্ডিতের আগমন হ'ল সেখানে। তিনি প্রভুর জন্য বাড়ীতে ভোগরাগের ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু হল ঠিক বিপরীত। রাঘব পণ্ডিতের আর বাড়ী ফেরা হ'ল না। ডুবে গেলেন তিনি এ আনন্দ স্রোতে—

সকল লোকের চিড়া যবে পূর্ণ হৈল।
ধানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল॥

নিতাইচাঁদের লীলাবিলাস আর ক্রিয়াকলাপ সাধারণ লোকচক্ষের অনধিগম্য। সকলেই দেখছে, প্রভু নিতাইচাঁদ যেন কাকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেক লোকের চিড়াভোগ দর্শন করাচ্ছেন আবার মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করছেন—খাও প্রভু! খাও ব'লে পরমানন্দে চিড়া ভোগ তুলে দিচ্ছেন তাঁর মুখে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

সবশেষে নিতাইচাঁদ চারিকুণ্ডি চিড়া নিয়ে মহাপ্রভুকে দক্ষিণ দিকে বসিয়ে প্রসাদ পেতে আরম্ভ ক'রলেন। এ সব লীলা ভাবদৃষ্টির গোচর। ভাব-গণ্ডীর বাইরে থেকে এ বস্তুর আস্বাদ মিলে না। 'হরি হরি' শব্দে সারা উৎসব প্রাঙ্গণ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল। সমাগত ভক্তবৃন্দের অন্তস্তলে এই লীলাটি সেদিন স্থায়ী ছাপ নিয়ে ব'সে যায়।

চারিকুণ্ডির অবশেষ যা ছিল তা শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথকে দিলেন। বাকি তিনকুণ্ডার প্রসাদ সমাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরিত হ'ল—

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিড়া দহি মহোৎসব খ্যাত নাম যার॥

এই লীলাই "রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব" নামে অদ্যাপি উদ্‌যাপিত হয়। তবে এ অনুস্মৃতির ধারাকে বাবাজী

মহারাজ পুনরুজ্জীবিত ক'রেছেন ভাবের মাধুর্য্যে ও সুরে রূপায়িত ক'রে। গতানুগতিক প্রথামত এখানে বরাবর এই দিনটিতে একটি ক'রে মেলা বসে যেত, বেশ লোকসমাগমও হত, নানাবিধ দ্রব্যের বেচাকেনা চ'লত। কিন্তু সাধারণের অবগতির বাহিরে থাকত উৎসবের প্রকৃত মর্ম্মার্থ। তাদের মোটামুটি ধারণা—নিতাই না গৌর কে যেন এক মহাপুরুষ এইদিনে এখানে পদার্পণ করেছিলেন।

বাবাজী মহারাজ তাঁর সুরের আলিম্পনে, ভাব ও প্রেমের উদ্বেলিত তরঙ্গে, নয়নের প্রেম ধারায় ভেসে ভেসে সবাইকে জানিয়ে দিলেন এই উৎসবের নিহিতার্থ ও রহস্যকথা। বাজিয়ে তুললেন তার প্রকৃত সুর। এই উৎসবের অনুষ্ঠিত প্রথায় যিনি যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন, সে মহাপ্রেমিক পুরুষ বাবাজী মহারাজ আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আজিকার দিনে মহোৎসবে কীর্ত্তনের সে মধুরস ক্ষরিত হয় না। ভক্তবৃন্দের সে আকুল ক্রন্দনও শুনি না। তবে কি নিতাইচাঁদ এখন আর আসেন না! তাও ত বিশ্বাস ক'রতে পারি না। কারণ বাবাজী মহারাজই তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে আর রসমধুর আখরে রেখে গেছেন এর উত্তর—

হা নিতাই! প্রভু নিতাই! একবার দেখা দাও। এই পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে, নিশ্চয় এসেছ তুমি। গঙ্গাতীরে এই বৃক্ষমূলে, নিশ্চয় এসেছ তুমি। তোমার ত্রিকালসত্য লীলায়, নিশ্চয় এসেছ তুমি। (নইলে) শত শত নরনারী, গৃহকর্ম্ম পরিহরি,

এসেছে কার আকর্ষণে ? ত্রিকালসত্য গৌর লীলা, শুনেছি শ্রীগুরু মুখে। তাই আশায় আশায় এসেছি। একবার দেখা দাও।

মহাপুরুষ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখ নিঃসৃত এ বাণীও যে ত্রিকালসত্য এতে সন্দেহ নাই। তবে এ সত্যকে জনচৈতন্যে ধরে রাখবার মত পরিবেশ কই, সে কাজের উপযুক্ত অধিকারী পুরুষ কই ?

আজো সেদিনকার সেই দণ্ড মহোৎসবের কথা মনে উদয় হ'লে নয়নপথে ভেসে ওঠে বাবাজী মহারাজের কণ্ঠের উচ্চারিত কীর্তন ও আখর। আর ভেসে ওঠে শ্রীনিতাইচাঁদের পানিহাটিতে বিহার ও লীলাবিলাসের কাহিনী।

বাবাজী মহারাজ ও পাঠবাড়ী

বাংলা তথা ভারতের বহুতর অঞ্চল মহাপ্রভুর দিব্য লীলায় পবিত্র হয়ে রয়েছে। এদেশের ভক্তিমার্গীয় সাধকের দল তাঁর এই সব লীলাস্থলীর ধূলিকণায়, এই সব পরম পবিত্র ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিয়ে থাকেন আবেগময় অনুভূতি নিয়ে, নিজেদের তনু মন প্রাণকে এক ক'রে দিয়ে। ভক্তিমান সাধক কাণ পেতে এখনও শুনতে পান প্রভুর চরণ নূপুরের ধ্বনি, দেখতে পান তাঁর অপ্রাকৃত লীলা। তাই তাঁরা অঙ্গে ধূলা মেখে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকেন প্রভুর চরণ নূপুরের ধ্বনি ও বাণী শুনবার জন্য।

জগতের বুকে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিভিন্ন দিকে বেড়ে চ'লছে মারণাস্ত্র নির্ম্মাণকল্পে, যার ফলে আজ ভয়াল আণবিক বোমার আবিষ্কার পর্য্যন্ত সম্ভব হ'য়েছে। কালের চক্রে একদিন হয়ত এ অস্ত্রেরও অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। কিন্তু যে প্রেমমহামন্ত্র জগতকে সঞ্জীবনীশক্তি দান করছে, তাকে রক্ষা ক'রে আসছে সে কোন-দিনই সরে দাঁড়াবে না। সেই প্রেমমন্ত্র একদিন বাংলার একটী বিশিষ্ট পল্লীতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল নবরূপে। সেদিনকার জাগরণের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল সব যুক্তি তর্ক ও সঙ্কীর্ণতা আর জেগে উঠেছিল একটি প্রেমঘন মূর্ত্তি। তিনি মানুষকে ভালবাসার মন্ত্র ও মূর্ত্তি দুই-ই দান করেছেন—তিনি আমাদের পতিতপাবন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ।

সেই প্রেমের ঠাকুরের পাদস্পৃষ্ট কলকাতার সন্নিকটতম সহরতলী বরাহনগর এবং বিশেষ লীলাক্ষেত্র শ্রীপাঠবাড়ী। কলকাতার এত কাছে যে পাঠবাড়ী আজ গ'ড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে কিছু ইতিবৃত্ত ব'লবার ইচ্ছায় অগ্রসর হ'চ্ছি।

সাধারণের চোখে আজ পাঠবাড়ী ব'লতে স্বধামপ্রবিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের লীলাক্ষেত্রকেই বুঝায় এবং এ পরিচয় খুব স্বাভাবিকও বটে। কারণ, ভক্তের মহিমা দিয়েই ভগবানের পূজা, ভক্তের পরিচয় দিয়েই ভগবানের পরিচয়। ভক্তকে দিয়েই তাঁর লীলা খেলা মেলা সব কিছু। সব কিছুই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ভক্তকে ধ'রে। এই পাঠবাড়ীর পশ্চাতে যে ইতিহাসটুকু জড়িত আছে তাই বর্ণনা করতেই এবার অগ্রসর হ'চ্ছি।

শ্রীরঘুনাথ উপাধ্যায় নামে এক নৈষ্ঠিক শাক্ত ব্রাহ্মণ বাস ক'রতেন বর্দ্ধমান জেলার চান্দুল পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত ঘোড়া-নাসী গ্রামে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কালে সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুশীলন কি পর্য্যায়ে নেমে এসেছিল তা নূতন ক'রে কিছু বলবার নাই। তখন বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ ছিলেন শাক্ত ও ধর্ম্মের নানা কুসংস্কারগ্রস্ত অনুশাসনের বেড়াজালে বদ্ধ। কিন্তু রঘুনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি যদিও শাক্ত কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি অধ্যয়নে বিশেষ আগ্রহশীল এবং বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জ্জন করেন। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু এ ধারণা তাঁর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু উপযুক্ত

সঙ্গ অভাবে শাস্ত্রালোচনায় সুখ পাচ্ছিলেন না। তাই অন্বেষণ ক'রছিলেন এমন একটা জায়গা যেখানে নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রানুশীলনে জীবনটা অতিবাহিত ক'রতে পারেন। সুযোগের অপেক্ষায় অতিবাহিত হয় বৎসরের পর বৎসর। অতঃপর প্রবীণ বয়সে এক সুযোগে বেরিয়ে পড়েন দেশত্যাগী হ'য়ে। নানাস্থান অনুসন্ধান ক'রে এসে হাজির হ'লেন বরাহনগরের নির্জ্জন গঙ্গাতীর মালীপাড়ায়।

ইচ্ছানুরূপ পরিবেশ পেয়ে রঘুনাথের মনে আনন্দ আর ধরে না। পশ্চিমদিকে কলনাদিনী গঙ্গা প্রবাহিত। চতুর্দ্দিকে শান্ত মধুর নিস্তব্ধতা। একটি পুকুরের পাড়ে দুটি বৃহৎ নিমগাছের মাঝামাঝি জায়গায় রঘুনাথ একটি কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে বাস ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন আর ভজনের মধ্যে চলে গৃহ হ'তে আনীত শ্রীদামোদর গোপালের সেবা। বাকি সময় কাটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে।

রঘুনাথের মনে কিন্তু শান্তি নাই। যেন কিসের অভাব মনের মূলে ঘোরাফেরা ক'রছে। শাস্ত্রানুশীলনের মরমী সঙ্গীও পাচ্ছেন না।

•

একদিন বৈকালে রঘুনাথ গঙ্গাতীরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তায় ধ্যানস্থ। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য রঙ্গীন ছটা বিছিয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক রঘুনাথের কাছে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মশাই! শুনেছেন কি? নবদ্বীপে গঙ্গার তীরবর্ত্তী ভূমিতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীভগবান নাকি আবির্ভূত হ'য়েছেন!

কথা কয়টী রঘুনাথকে নূতন এক চিন্তার জগতে এনে হাজির ক'রল। শ্রীমদ্ভাগবতের নন্দরাজার প্রতি গর্গমুনির বাক্য শ্লোকটী মনে পড়ে গেল—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুম।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

মনের মধ্যে চ'লেছে নানা দ্বন্দ্বের দোলা। ইনিই কি সেই? যাঁর সম্বন্ধে আবার বিশ্বসার তন্ত্রের একাদশ পটলে শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে ব'লছেন—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলি পাপ বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যা নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ॥

রঘুনাথ ব্যস্ত ভাবে ভদ্রলোকটিকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই! এ সংবাদ আপনি কোথায় পেলেন? তদুত্তরে ভদ্রলোক আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ ক'রলেন—"কাল সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে ব'সে আছি। এমন সময় চোখে পড়ল এক ভদ্রলোক গঙ্গায় দ্রুতপদে স্নান করবার জন্য নামছেন। দেখে মনে হ'ল কোন পথশ্রান্ত বিদেশী হবেন। কিছু কথাবার্ত্তার পর তাঁকে আমার আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ জানাই। পরে পরিচয় নিয়ে জান্‌লাম—তিনি আসছেন যশোহর জেলার তাল-খড়ি গ্রাম থেকে। যাবেন নবদ্বীপ—তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা লোক-নাথের অনুসন্ধানে। লোকনাথ লাউড়াধিপতি রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রীপুত্র শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলে নিমায়ের সহপাঠি। পরে

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যাঁর অধ্যাপনার ভার নিমাইয়ের উপরই অর্পণ করেন। অধ্যাপনান্তে লোকনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এবার মাতাপিতা তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা ক'রছেন জানতে পেরে নানা-ভাবে তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় একদিন গভীর নিশীথে সকলের অলক্ষিতে লোকনাথ জীবনের মত তালখড়ি ত্যাগ করে নবদ্বীপে আসেন। পরে নিমায়েরই আদেশে নাকি শ্রীধাম বৃন্দাবন গেছেন এরূপ শোনা যাচ্ছে। তাই তাঁর মাতাপিতা শোকার্ত্ত হয়ে এঁকে এ সংবাদ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানবার জন্য নবদ্বীপ পাঠিয়েছেন।"

রঘুনাথ এ বৃত্তান্ত শ্রবণে স্তম্ভিত হলেন, নবদ্বীপ যাত্রার সংকল্প নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কালবিলম্ব না ক'রে সঙ্গে একটী মাত্র জলপাত্র ও শ্রীগোপাল বিগ্রহটী বক্ষে ধারণ করে তিনি রওনা হন। আহার নিদ্রা নাই, সারারাত্রব্যাপী গঙ্গার তীরে তীরে এগিয়ে চ'লেছেন। কতক্ষণে অভীপ্সিত পুরুষের সাক্ষাৎ পাব, একথাই চিন্তার রাজ্যে নানা রূপ নিয়ে ঘোরাফেরা ক'রছে। ক্রমে পরদিবস বেলা তৃতীয় প্রহরে রঘুনাথ নবদ্বীপে এসে পৌঁছলেন। নবদ্বীপ তখন শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এক আদর্শ নগরীও বটে। এককালে গৌড়াধিপ কিছু-কালের জন্য এখানে রাজধানীও স্থাপন ক'রেছিলেন। ইদানীং নবদ্বীপ-পূর্ণশশী শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমের বন্যায় আপামর নর-নারীকে ভাসাচ্ছেন। রঘুনাথ আজ নবদ্বীপের আকাশ বাতাস

জনপদ বাজার গৃহ ও গৃহস্থালী সবের মধ্যে প্রেমের সুষমা অনুভব করেন, সারা মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেন। এভাবে রঘুনাথ এসে পড়লেন পৌড়ামাতলায় (পোড়ামাতলা)। কোথায় গৌরসুন্দর থাকেন তা রঘুনাথ জানেন না। তাই চোখের তারাছুটি যেন পাগলের মত ঘোরাফেরা ক'রছে কাউকে দেখবার জন্য। কিন্তু তিনি কৈ?

একান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃশব্দে। চোখে প'ড়ল একটি সদাচারী সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ। তাঁকে সব কথা জানালেন। তিনি অতি আগ্রহভরে রঘুনাথকে সঙ্গে ক'রে শ্রীবাসঅঙ্গনে হাজির হ'লেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত রঘুনাথের পরিচয় পেয়ে যথোপযুক্ত আতিথ্যে আপ্যায়িত ক'রলেন। সঙ্গের ব্রাহ্মণটি রঘুনাথকে শ্রীবাসঅঙ্গনে সমাগত ভক্তদের পরিচয় দিলেন।

চাঁদের হাট ব'সেছে। শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস, মুরারী, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদবর্গ সকলেই উপস্থিত। তাঁরা শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ব'সে আছেন। সন্ধ্যা সমাগমে গৌরসুন্দর বামে গদাধর দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছুজনের কাঁধে ছুটি হাত রেখে এগিয়ে আসছেন শ্রীবাসঅঙ্গনের দিকে। প্রভুর গলদেশে মালতীফুলের মালা, সর্ব্ব অঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত। পরিধানে ধবলপাটের জোড়, আজানুলম্বিত বাহুযুগে পুষ্পবলয় ও প্রশস্ত ললাটে তিলক শোভা পাচ্ছে। সে রূপসাগরে ঝাঁপ দেবার জন্য পথের ছুধারে, গবাক্ষে ও ছাদে জনতার ভীড়। রঘুনাথ সে রূপ-সাগরের অতল তলে তলিয়ে গেছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাস অঙ্গনে পৌঁছে তাঁর সর্ব্বমনোহারী দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার ক'রে সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রতি কৃপাসঞ্চার ক'রলেন। তারপর নবাগত রঘুনাথের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন। উত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত জানালেন—ইনি বরাহনগরে থাকেন। নাম শ্রীরঘুনাথ উপাধ্যায়। আপনার দর্শনার্থী হ'য়েই এসেছেন।

রঘুনাথ এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। এবার ছিন্নমূল তরুর মত প্রভুর শ্রীচরণে পতিত হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'লেন। প্রভু তখন গদাধরের প্রতি নির্দ্দেশ দিলেন—এঁর সব কিছু ভার তোমার উপর। এঁর যা কিছু প্রয়োজন তুমিই যোগাবে। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ ক'রলেন। সে অমিয় শীতল বক্ষের স্পর্শে রঘুনাথের চৈতন্য ফিরে এল ও নিজেকে নিতাইচাঁদের বাহুযুগে আবদ্ধ দেখে আনন্দ পাথারে তিনি ডুবে গেলেন। ক্রমে শ্রীবাস অঙ্গনে বেজে উঠল খোল কর-তালের স্বচ্ছন্দ রঙ্গ। এবার আরম্ভ হ'ল সংকীর্ত্তন লীলা আর শ্রীগৌরসুন্দরকে ঘিরে কীর্ত্তন মহারঙ্গ—

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ মেতে উঠেছেন উন্মত্তের মত। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর পাশে পাশে ফিরছেন ছায়ার মত। পাছে প্রভু দিব্য ভাবাবেশে ঢলে পড়েন। কারও বাহ্যস্মৃতি নাই। রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হ'ল তবুও কীর্ত্তন মহারঙ্গে উল্লাসের একটুও বিরতি নাই।

এবার প্রভাতের ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে। কীর্ত্তন সমাপ্ত হ'ল। কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা আলাপনের পর সকলে গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা ক'রলেন। পথিমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরকে ডেকে ব'ললেন—তুমি এঁকে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও। আবার রঘুনাথকে ব'ললেন—আপ্‌নি অদ্যই বিকেলে বরাহনগরে যেখানে ভজন করেন সেখানে চ'লে যান। রঘুনাথ এ আদেশের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। হতাশার মলিনরেখা মুখের উপর খেলে গেল। ব'ললেন—প্রভু আমি আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাব? কৃপা ক'রে নবদ্বীপে থাকবার আদেশ দিন। তদুত্তরে প্রভু রঘুনাথের পিঠে স্নেহসূচক চপেটাঘাত ক'রে ব'ললেন—রঘুনাথ দুঃখ ক'রো না। তুমি তোমার স্বস্থানে ফিরে যাও, আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে।

রঘুনাথ বুঝলেন, প্রভু কোনরকমেই তাঁকে এখানে রাখতে ইচ্ছা করেন না। তখন চুপি চুপি শ্রীবাসপণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছার কথা প্রভুকে জানাবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত তা প্রভুকে জানালেন। তদুত্তরে প্রভু ব'ললেন—আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি। রঘুনাথের যা কিছু প্রয়োজন তা গদাধরই দিবে। গঙ্গাস্নানান্তে রঘুনাথ গদাধর গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। সেই দিনই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাদানান্তে গোস্বামী রঘুনাথকে কিছুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রে শুনান। রঘুনাথের শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ অধিকার আছে জান্‌তে পেরে তিনি ভাগবতের একটী বঙ্গানুবাদ করবার জন্য নবশিষ্যটিকে আদেশ করেন। প্রভুর আদেশমত বৈকালে সকলের কাছে

বিদায় নিয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে রঘুনাথ যাত্রা সুরু করলেন বরাহনগরের উদ্দেশ্যে।

বরাহনগরে প্রত্যাগমন করে রঘুনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর সংকীর্ত্তন বিলাসরঙ্গ স্মরণ করেন দিনের পর দিন। নয়নের জলে বুক ভেসে যায়। স্মৃতিপথে জেগে উঠে গৌররূপের লাবণ্যচ্ছটা। নিমীলিত নয়নে শ্রীবাস-অঙ্গনের নৃত্যবিলাস রঙ্গে বিভোর হ'য়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তন্ময়তার রেশ একটু হাল্কা হ'লে আবার গুমরে কেঁদে ওঠেন। আর নিজ কুটীর অঙ্গনের দিকে তৃষিত নয়ন দুটী বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে থাকেন যেন কাউকে দেখবার জন্য। নয়নের দুটী কোণ হতে ঝরে পড়ে মুক্তার মত অশ্রুধারা। কৈ এখনও ত এল না। রঘুনাথের তৃষিত নয়ন-দুটী দিনের পর দিন শ্রীশ্রীগৌরের করুণামেঘের বর্ষণধারার আশায় ব'সে আছে।

বিরহদাহে রঘুনাথের দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে যাচ্ছে। সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নাই। নয়নদুটিতে ক্ষণে ক্ষণে উপছে প'ড়ছে গৌর অনুরাগের প্রবল জোয়ার। শীর্ণমুখে ফুটে উঠেছে অনুরাগের রক্তিম আভা। বিরহের এমনই জ্বালা। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল পথের পানে দৃষ্টি ছুটে চ'লেছে। নিত্যকার সেবা দামোদর গোপালের পূজায় বসেন। বহুক্ষণ কেটে যায়, তবু তাঁর পূজা শেষ হয় না। মন্ত্র অর্দ্ধেক বলেন আর একবার ক'রে উঠে বাইরে যান। বেড়ার দরজা খুলে চেয়ে দেখেন, কে যেন বড় আদর মিশ্রিত কণ্ঠে তাঁকে রঘুনাথ বলে

ডাকল। কিন্তু কৈ, কেউ তো নাই। তবে কি একবার এসে ফিরে গেল? না! তবে আমারই হয়তো ভুল—এই ভেবে আবার ফিরে গিয়ে তিনি পূজায় বসেন।

রঘুনাথের এ বিরহজ্বালা ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমকে পরাজয় ক'রেছে, শবরীর শুদ্ধাপ্রেমের তুলনারও এ উর্দ্ধে। রঘুনাথের বিরহজ্বালা আজ এত সুতীব্র কেন? শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভের পূর্ব্বে কিসের জ্বালায় রঘুনাথ ঘরের বাহির হলেন? এলেন বরাহনগরে! সেখানে থেকেও শান্তি পেলেন না। জ্বালা ঘুচল গৌরসুন্দরকে পেয়ে। গদাধরের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের সেবায় ডুবে গেলেন। এতদিন রঘুনাথের বিরহ বুঝি ছাই চাপা আগুনের মত জিইয়েছিল। গদাধরের আনুগত্যে প্রাণনাথকে পেলেন বটে, কিন্তু আবার সঙ্গহারা হ'য়ে সে বিরহ জ্বালা দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে একেবারে দ্বিগুণ হ'য়ে। গৌরসুন্দরকে এবার আসতেই হবে। নাহ'লে রঘুনাথের এ দেহ থাকবে কিনা সন্দেহ। বিরহ-দাহ কিছুটা কম হ'লে ব'সে পড়েন শ্রীগদাধর গোস্বামী আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে। এ সময়েই তিনি শ্রীমদ্‌-ভাগবতের বঙ্গানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী' লেখা সমাপ্ত করেন বলে শোনা যায়।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর বয়ক্রমকালে ১৪৩১ শকাব্দার মাঘ মাসে গৃহত্যাগ ক'রে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখান থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য প্রভু চ'লেছেন উন্মাদের মত আর বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ ক'রছেন। আর

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস ভক্তগণের ক্রন্দনে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। শচীমাতা পাগলিনী প্রায়, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছিতা।

স্বভাবকরুণ নিতাইচাঁদের হৃদয় কেঁদে উঠল। আশ্বাস দিলেন প্রভুকে ফিরিয়ে আনবার, তারপর প্রভু যে পথে বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে চলেছেন সেখানে এসে হাজির হ'লেন ও নানা ছলনায় প্রভুকে ফিরিয়ে আনলেন শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্য্যের কুটীরে। এখানে এসে নবদ্বীপবাসী, শচীমাতা ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলনানন্দে কাটালেন কয়েকদিন। তারপর মায়ের আদেশ মত হাজির হ'লেন শ্রীধাম পুরীতে।

প্রথম দুই বৎসর দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রলেন ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করে। তারপর দুই বৎসর পুরীতে অবস্থান করলেন। পঞ্চম বৎসরে কার্ত্তিক মাসে বিজয়া দশমীর দিন বৃন্দাবন যাত্রার মানসে তিনি রওনা হন। ইচ্ছা রইল, পথে জননী, জন্মভূমি ও জাহ্নবী দর্শন করবেন। কৃষ্ণা দশমীর দিন উপনীত হন পানিহাটি গ্রামে শ্রীশ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে।

এখান থেকে রওনা হয়ে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে উপস্থিত হন নবদ্বীপের পরপারে কুলিয়ায় সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির বাসায়। এভাবে মাঘমাসে মালদহের অন্তর্গত রামকেলী পর্য্যন্ত আসেন। এখান থেকে প্রভু আবার ফিরতি পথ ধ'রলেন—বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখলেন এবারের মত। কারণ দেখালেন, এত লোকসংঘট্টে বৃন্দাবন যাওয়া সমীচীন হবে না। বুঝি বা রঘুনাথের বিরহ জ্বালাই প্রভুকে ফিরতে বাধ্য করেছে, তার সন্ধান কে রাখে! কালনা ও কুমারহট্ট

হ'য়ে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দশমীতে আবার পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হন। একাদশীর দিন এখানে অবস্থান করে দ্বাদশী মধ্যাহ্নে নৌকাযোগে উপস্থিত হন বরাহনগর গ্রামে। নৌকা থেকে অবতরণ ক'রে প্রভু চ'লেছেন গ্রামের পথে। হঠাৎ কানে ভেসে এল, কে যেন সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করছেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে উন্মত্তের মত প্রভু ছুটে চললেন।

কিম্বদন্তী শোনা যায়, রঘুনাথ একবার ভাগবতের গোপীগীত পাঠ করতে করতে মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। তাঁর তৃষিত আঁখি তখন গৌরমুখপদ্ম মধুপানে প্রমত্ত ভৃঙ্গের মত আত্মহারা—গ্রন্থের পাতায় আর দৃষ্টি ফিরতে চায় না। আজ বুঝি বা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সচল বিগ্রহরূপে রঘুনাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সার্থক ভাগবত পাঠ। ত্রস্তপদে রঘুনাথ আসন ছেড়ে প্রভুর চরণে পতিত হবার জন্য উঠছেন। প্রভু "বোল! বোল" শব্দ উচ্চারণ ক'রে অধ্যয়নের ইঙ্গিত করলেন। রঘুনাথ পাঠ করছেন আর প্রভু গোপীগীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী আস্বাদনে তৃপ্ত হয়ে পুনঃপুনঃ "বোল বোল" শব্দ উচ্চারণ করছেন।

এবার রঘুনাথ অবস্থানুযায়ী অনুকূল শ্লোক পাঠ ক'রে প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন ক'রছেন। ক্রমে প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাব্যঞ্জক মধুর রসাত্মক 'যত্তেসুজাত' শ্লোকটি পাঠ করামাত্র প্রভু গভীর হুঙ্কার গর্জ্জনসহ ভূতলে পতিত হলেন।

এভাবে রঘুনাথ পাঠ করেন আর প্রভু কখনো প্রেম-নৃত্যে কখনও বা আনন্দ আবেশে ভূমিতলে পতিত হন। রাত্রি তৃতীয়

প্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য করার পর প্রকৃতিস্থ হয়ে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ ক'রে বলেন—"আচার্য্য! তুমি আজ আমায় বড় আনন্দ দিলে, ইতিপূর্ব্বে বহুবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনেছি কিন্তু এমন সুখ কখনও পাইনি। আজ থেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য রইল। ভাগবত পাঠরূপ সেবাদ্বারা তোমার জীবন অতিবাহিত কর!"

তদবধি রঘুনাথ উপাধ্যায় শ্রীভাগবতাচার্য্য নামে স্থানীয় লোকের কাছে পরিচিত হন। এরূপ প্রবাদ শুনা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু নাকি আচার্য্য ঠাকুরের ভাগবতপাঠ শ্রবণে আকৃষ্ট হ'য়ে এখানে তিনদিন অবস্থান করেন। যে ঘাটে তিনি স্নান ক'রতেন অদ্যাবধি সে ঘাটের নাম "শ্রীমহাপ্রভু ঘাট" নামে বিদিত রয়েছে। এবার শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। আচার্য্যঠাকুরও অনুগমন ক'রছেন। কিছুদূর যেয়ে প্রভু আচার্য্যকে ব'ললেন—তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাও, শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় তৎপর হও।

কিন্তু আচার্য্য কি নিয়ে ফিরে যাবেন? যার নয়নের জ্যোতি, অসন বসন ভোজ্য পেয় সবই শ্রীমন্মহাপ্রভু, সে কি প্রভু বিহনে এক তিল থাকতে পারে! 'ফিরে যাও' এ কথার মধ্য দিয়ে আচার্য্যের অন্তরে বিরহের অগ্নিশিখা দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে। প্রভু বুঝলেন আচার্য্যের অন্তর। নিজের শ্রীচরণ থেকে খড়মজোড়া আচার্য্যকে দিয়ে ব'ললেন,—এই নিয়ে তুমি ফিরে যাও। এতেই তোমার বিরহজ্বালা প্রশমিত হবে।

মহাপ্রভু এবার দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন। আচার্য্য ঠাকুর পবিত্র খড়মজোড়া মস্তকে ধারণ ক'রে ফিরলেন নিজ কুটীরে। অদ্যাপিও সেই খড়মজোড়া অতিযত্নে সেবিত হ'য়ে থাকে। ইহাই শ্রীপাঠবাড়ীতে প্রভুর শুভাগমন লীলার সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আচার্য্য ঠাকুর তাঁর নির্জ্জন পর্ণকুটীরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মধু-গুঞ্জনে কতদিন অতিবাহিত করেন তার সঠিক কোন প্রমাণাদি পাওয়া যায় না।

· ভাগবতাচার্য্যঠাকুর সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত সন্ধান আমরা পাই। কিন্তু এরপর কতদিন তিনি প্রকট ছিলেন তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্য আগমন তিথিকে যিনি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও লোকচক্ষুর দর্শন স্পর্শনের মধ্যে থেকে, তাঁর সুর-স্বর-ধ্বনির তরঙ্গের রঙ্গে নিখিল মানবের চিত্তকুঞ্জে নিত্যত্বে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, সেই প্রেমমন্ত্র-মহাসাধক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কথা পাঠবাড়ীর প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে বিজড়িত। আরও আনন্দের কথা তাঁরই একান্ত আগ্রহে পাঠবাড়ী থেকে প্রকাশিত নিতাইসুন্দর পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী" প্রকাশিত হ'য়েছে।

বর্ত্তমানে এই পাঠবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সুরম্যমন্দিরে পরিশোভিত হ'য়ে জগতের কাছে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রকৃষ্টতম কেন্দ্র হিসাবে বিরাজমান। এ প্রতিষ্ঠানের পিছনে যে ইতিহাসটুকু আত্মগোপন ক'রে আছে সে সম্বন্ধে এবার কিছু আলোচনা করা যাক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যঠাকুরকে বিদায় দিয়ে নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায়ে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েছেন এমন সময় (বর্ত্তমান কুঠিঘাটায়) কুড়িয়ে পান হরিদ্রাবর্ণের একটি আম। সম্মুখের একটী সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবককে সেটী দিয়ে বলেন—এ আমটীর রং তোমার মত। অতএব এটি তোমার। ব্রাহ্মণ এ আমটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নিজ বাগানে রোপণ করেন। ক্রমে সেটী বৃক্ষে পরিণত হ'লে নাম রাখেন মহাপ্রভুর বৃক্ষ। বৃক্ষটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুন্দর ফল দিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসর প্রথম ফলটি আচার্য্যঠাকুরের গোপালকে দিয়ে তবে ব্যবহার ক'রতেন।

এই সূত্রেই সেই ব্রাহ্মণ পরিবার বংশানুক্রমে 'সুন্দর বংশ' নামে খ্যাত এবং বর্ত্তমানে তাঁরা পুরুষানুক্রমে বরাহনগরেই বসবাস ক'রছেন। বর্ত্তমানে বাগানটী প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী জহরলাল পান্নালাল-এর বংশধরদের অধিকারে আছে। যদিও উক্ত বৃক্ষটির অন্তর্দ্ধান ঘটেছে কিন্তু তার নিকটেই একটী চারাবৃক্ষে সেই রকমই ফল ফ'লে থাকে। সেই বৃক্ষের প্রথম ফলটি অদ্যাপিহ পাঠবাড়ীর মহাপ্রভু গ্রহণ করেন।

এদিকে আচার্য্যঠাকুর সাশ্রুনয়নে প্রভুদত্ত খড়মজোড়া বক্ষে ধারণ ক'রে ফিরলেন নিজ পর্ণ কুটীরে। নিজেকে তিনি সর্ব্বক্ষণ ডুবিয়ে রাখলেন ভজন আবেশে। সেবার মধ্যে শ্রীগোপাল বিগ্রহের ভক্তিপূর্ণ পূজা ও প্রভুদত্ত খড়মজোড়া বক্ষে ধারণ ক'রে নীরবে অশ্রুবর্ষণ। বাকি সময় বরাহনগরের নির্জ্জন মোহন গঙ্গাতীর ভ'রে ওঠে পরমভাগবত আচার্য্যের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের

মধুগুঞ্জনে। সঙ্গীর মধ্যে তাঁর একমাত্র শিষ্যস্থানীয় এক ব্রাহ্মণ বালক।

এভাবে আচার্য্যঠাকুর কতদিন প্রকট ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এরূপ অনুমান করা হয় যে, প্রভুর নীলাচল যাত্রার পর আচার্য্যঠাকুর খুব অল্পদিনই প্রকট ছিলেন ও অন্যত্র কোথাও যান নাই। কারণ গৌড়দেশের ভক্তদের প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল বৎসরে একবার করে রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসবার। সেখানে আচার্য্যঠাকুরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বরাহনগরের অনতিদূর পানিহাটি গ্রামে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বহুভক্তসমভিব্যহারে নানা লীলারঙ্গে তিন মাস অতিবাহিত করেন। সেখানেও আচার্য্যের কোন সন্ধান মেলে না।

যা'হক আচার্য্যঠাকুর নিজের অন্তিমকাল সমুপস্থিত জেনে এক অবসরে শিষ্যটীকে ডেকে ব'ললেন—দেখ বাবা! আমার অপ্রকটের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যেস্থানে নৃত্য করেছেন সেখানেই সমাধি দিও! আর সঙ্গে দিও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি। তোমার যদি এই নিঃসঙ্গ জীবন ভাল না লাগে তবে শ্রীগোপাল বিগ্রহ ও প্রভুপ্রদত্ত খড়মজোড়াও আমার সঙ্গে দিয়ে তুমি বৃন্দাবনের পথে রওনা হ'য়ে যেয়ো। আচার্য্যঠাকুরের অপ্রকটের পর গুরুর আদেশমত কার্য্য ক'রে শিষ্যটি বৃন্দাবনের পথে রওনা দিলেন। তদবধি এ বালকের কোন অনুসন্ধান মেলে নাই।

বহুবৎসর অতিবাহিত হয়। ক্রমে আচার্য্যঠাকুরের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে আসে। জনশ্রুতি হিসাবে থেকে যায় স্থানটির পরিচয় স্থানীয় প্রবীণদের মুখে মুখে। আর

স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প'ড়ে থাকে আচার্য্যঠাকুরের ভগ্নাবশেষ কুটীর, একটি পুষ্করিণী ও তার তীরবর্ত্তী দুটি নিম্ববৃক্ষ।

একসময় ওলন্দাজেরা বরাহনগরে গ'ড়ে তোলে তুলা ব্যবসার একটি বড় কেন্দ্র। তাদের একজন গভর্ণরও এখানে বাস করতেন। সে বাড়ীটির ফটকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি পাথরের ফলকে অদ্যাপি লেখা আছে—"ডাচ্ কিউটার"—

"দিস্ হাউস ওয়াজ দি রেসিডেন্স অফ দি ডাচ্ গভর্ণর হোয়েন বরানগর ওয়াজ আণ্ডার ডাচ্ পজেশন"। এ সময় দেখা দেয় বোম্বেটে জলদস্যুর উৎপাত। ওলন্দাজেরা এদের কাছে নানা-ভাবে সাহায্য পেত। তাই দস্যু দমনে তাদের মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন হ'ত না। ফলে বোম্বেটেদের দস্যুবৃত্তি চ'লত নিরঙ্কুশভাবে। তারা দিনমানে বেতের ঝুড়ি তৈরী ক'রে মেয়েদের দিয়ে গ্রামের ভিতর বিক্রী করাত আর রাত্রে ঘুসুরীর চড়ার বাঁকে আত্মগোপন ক'রে থাকত। নিরীহ যাত্রীদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে সর্ব্বস্ব ক'রত লুটপাট। সামান্য লাভের জন্য নরহত্যা ক'রতে তাদের এতটুকুও বাধত না।

আচার্য্যঠাকুরের যে সামান্য স্মৃতিটুকু মাথা তুলে জেগেছিল তাও ক্রমে আশ্রয় নিল কালের কুটিল গহ্বরে। এ স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। পিতা পিতামহদের বর্ণিত ঘটনা ক্রমে স্থানীয় লোকদের কাছে রূপকথায় রূপান্তরিত হ'তে বসেছে। এর পরই ব'লতে হয় অবলুপ্ত স্মৃতিগুলি আবার কিভাবে লোক-

লোচনের গোচরীভূত হ'ল, তার কাহিনী। প্রবীণ বরাহনগরবাসীর নিকট সংগৃহীত বহু তথ্য এর উপকরণ।

কলকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ অম্লশূল ব্যারামে বহুদিন কষ্ট পাচ্ছিলেন। নানা ঔষধ প্রয়োগের পর আরোগ্যলাভে অসমর্থ ব্রাহ্মণ হত্যা দিলেন বাবা তারকেশ্বরের দুয়ারে। অনাহারে অনিদ্রায় তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বাবা তারকনাথ প্রসন্ন হ'য়ে স্বপ্নাদেশে বলেন—বরাহনগর মালীপাড়ায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী একটি বিরাট পুষ্করিণী আছে। তার পূর্ব্ব পার খনন ক'রলে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত, একটি শ্রীগোপাল বিগ্রহ, একজোড়া খড়ম ও একটি শালগ্রাম নারায়ণ পাবে। পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী দুটি নিম্ববৃক্ষ ছেদন করে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের মনোরম দুটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে প্রাপ্তদ্রব্যগুলি সমেত সেবা প্রকাশ ক'রবে। তবেই তুমি এই শূলবেদনা থেকে চিরতরে আরোগ্যলাভ ক'রে সুস্থ জীবন লাভ ক'রবে।

ব্রাহ্মণ স্বস্থানে প্রত্যাগমনান্তে অল্পদিনের মধ্যেই স্বপ্নাদিষ্ট পুষ্করিণীর পার থেকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত সমস্ত জমি দয়ারাম পাল নামক এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে খরিদ ক'রলেন। কিন্তু ভ্রম-বশতঃ পুষ্করিণীর পূর্ব্বপারের পরিবর্ত্তে পশ্চিমপারে খনন কার্য্য আরম্ভ ক'রলেন। ফলে উক্ত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত না হ'য়ে ব্রাহ্মণ পুনরায় বাবার কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলেন। বাবা স্বপ্নাদেশে জানালেন—তুমি পশ্চিমপার খনন ক'রেছো। তাই সেগুলি পাওনি—যাও! শীঘ্র পূর্ব্বপারে খনন কার্য্য আরম্ভ কর! অবশ্যই দ্রব্যগুলি পাবে।

ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন। শ্রীতারকনাথের নির্দ্দেশমত কার্য্য

আরম্ভ করে আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেন। একটু খনন করা মাত্র এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার ক'রে তেড়ে আসে। আতঙ্কে কুলিরা এ কার্য্যে ভঙ্গ দেয়। ব্রাহ্মণ পড়লেন মহা ফাঁপরে। কাতর কণ্ঠে বাবা তারকনাথের উদ্দেশে তিনি প্রার্থনা জানালেন—বাবা তোমার নির্দ্দেশ দাও।

নয়ন জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। মিনতিভরা কণ্ঠে বারবার ব'লছেন—বাবা কৃপা ক'রেও এত ছলনা কেন?

দারুণ শূলবেদনার অসহ্য যন্ত্রণা। ব্রাহ্মণ কষ্টে অভিমানে ক্ষোভে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তাই মনে সঙ্কল্প ক'রেছেন—আজ রাত্রেই গঙ্গার জলে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন।

"ঠাকুর! তোমার কাছে আর হত্যা দেব না"। ক্লান্তি, অবসাদ ও নিরাশায় ব্রাহ্মণ কখন যেন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

এবার বুঝি বৈকুণ্ঠের আসনও টলেছে। তাই বুঝি বা আদিষ্ট মূর্ত্তির মত সচল বিগ্রহদু'টি ১০।১২ বৎসরের বালকের বেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণকে সোহাগজড়িত সুরে ডেকে ব'ললেন—ওঠ দুঃখ করো না! খনন কার্য্য তুমি স্বহস্তেই কর। তাহ'লেই অভিলষিত দ্রব্যগুলি অবশ্য পাবে। আর আমাদের এই মূর্ত্তির অনুরূপ দু'টি বিগ্রহ নির্ম্মাণ ক'রে সেবা প্রকাশ ক'রবে। এতেই তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হবে।

তন্দ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র দেখতে পেলেন একটি সুড়ঙ্গপথ। অল্পদূরে পথের একটি ইট সরাবামাত্র ব্রাহ্মণ সেই দ্রব্যগুলি পেয়ে আনন্দসাগরে ডুবে গেলেন।

এগুলো পাওয়া মাত্র খনন কার্য্য বন্ধ ক'রে দিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে তু'জন উত্তম ভাস্কর আনালেন। নিম্ববৃক্ষ ছেদন ক'রে নিতাই গৌর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ক'রলেন তাদের নিয়োগ। ইতিমধ্যে নিম্ববৃক্ষের নীচে ছোট একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে মাঘীপূর্ণিমার দিন করা হো'ল সেবা প্রতিষ্ঠা। অদ্যাপি পাঠ-বাড়ীতে সেই মূর্ত্তিই পূজিত হ'চ্ছেন।

পরে ব্রাহ্মণ জানতে পারলেন যে এটি শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের ভিটা। আর প্রাপ্ত দ্রব্যের স্থানটিই আচার্য্যের সমাধি স্থান অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যস্থলী। সেখানেও একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে নাম রাখলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যের পাঠঘর।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন খড়দহের গোস্বামী প্রভুদের শিষ্য। তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে শ্রীরাধা-রাধারমণ, জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর সেবা ছিল। তুই জায়গায় সেবার জন্য বড় অসুবিধা হওয়ায় বাগবাজার বাড়ীর সেবাগুলিও এখানে আনা হয়। আজিও ভক্তবৃন্দ পাঠবাড়ীর শ্রীমন্দিরে সেই বিগ্রহগুলি দর্শন ক'রে থাকেন।

ব্যাধিমুক্ত কালীপ্রসন্নের বাকী জীবন অতিবাহিত হয় স্বহস্তে ঠাকুরের সেবা নিষ্ঠায়। ক্রমে তাঁর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেবার ধারাটি চ'লে আসে বহুবৎসর যাবৎ। পৌত্র ভোলানাথের তিনটি কন্যা। কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এই কন্যাদের বিবাহ হ'য়ে যাওয়ার পর ভোলানাথের পক্ষে সেবা চালান প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। তখন কার্ত্তিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক পূজারীর

দ্বারা চালাতে থাকেন সেবাকার্য্য। কার্ত্তিক চন্দ্রের একমাত্র পুত্র লোকনাথ বিবাহের অল্পদিন পরেই দেহরক্ষা করেন। বিধবা পুত্রবধূ এ সেবা চালাতে পারবে না বুঝতে পেরেই কার্ত্তিকচন্দ্র ১২৩২ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীস্বরূপ দাস বাবাজী নামে এক বৈষ্ণবকে সেবাটি হস্তান্তর করেন।

এই বাবাজী মহোদয় অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকের কাছে সিদ্ধপুরুষ ব'লে পরিচিত হন। তাঁর সদাবিনম্র সাত্ত্বিক মূর্ত্তিটি স্বভাবতঃ লোকের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে।

বাবাজী মহোদয়ের সেবাগ্রহণের এক বছরের মধ্যেই একটী অত্যদ্ভুত ঘটনার অবতারণা হয় পূর্ব্বকথিত বোম্বেটেদের নিয়ে। মুর্শিদাবাদের নবাবের একটি নৌকা কলকাতা থেকে দশ পিপা ঘৃত নিয়ে ফিরছিল। বোম্বেটেরা তা লুট করে ঘুসুরির চড়ায়, আরোহীদের হত্যা ক'রে নৌকা ডুবিয়ে দেয় মাঝগঙ্গায়। কোন-ক্রমে একটি লোক রক্ষা পেয়ে যায়। সাঁতরে সে গঙ্গা পার হয় ও মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে।

এ সংবাদ শ্রবণে নবাব তো ক্ষিপ্তপ্রায়। সঙ্গে সঙ্গে বহু সিপাহী পাঠালেন দুষ্কৃতিকারী ও পিপাগুলির অনুসন্ধানে। বোম্বেটেরা সিপাহীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। দু'মাস অতীত হ'ল পিপার কোন সন্ধান হ'ল না। ইত্যবসরে এক অশুভের ইঙ্গিত বোম্বেটেদের চিন্তান্বিত করে তোলে। তারা পিপাগুলি লুকিয়ে রেখেছিল মহাপ্রভুর মন্দিরের পিছনের পুষ্করিণীতে। কিভাবে তার মধ্যে একটি পিপা ফুটো হ'য়ে সারা পুষ্করিণীতে ঘৃত ভাসতে

সুরু করে। বোম্বেটেদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হ'ল—নবাবের অনুচরেরা সন্ধান পেলে আর রক্ষা থাকবে না। রাজার শাসনে বংশসমেত অন্তিম শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। নিরুপায় হ'য়ে তারা শরণাপন্ন হ'ল উক্ত বাবাজী মহোদয়ের চরণে।

বাবাজী মহোদয় সব বিবরণ শুনে তাদের আশ্বস্ত ক'রলেন। সকলকে আহ্বান ক'রে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহের সামনে প্রতিজ্ঞা করালেন যে, এ যাত্রায় রক্ষা পেলে তারা আর জীবনে কোন-দিন এ বৃত্তিতে নিজেদের ভরণপোষণ করবে না। কতদিন বৃদ্ধ বাবাজী মহোদয়ের গণ্ড বেয়ে অশ্রুকণা ঝরে প'ড়েছে এই পাষণ্ডদের নরহত্যার কথা স্মরণ ক'রে। কতদিন দরজা বন্ধ ক'রে কতই না আকুতি জানিয়েছেন—"ঠাকুর! এদের মতি পরিবর্ত্তন ক'রে দাও"। তাই বুঝিবা ঠাকুরের কৃপার দ্বার খুলেছে এই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে।

পরদিবস প্রাতঃকাল থেকে যে কোন দর্শনার্থী এলেই বাবাজী মহোদয় ব'লতেন—আজ থেকে একমাসের ভিতর যে কেউ এই পুষ্করিণীতে পাঁচপোয়া গব্যঘৃত দান ক'রে যে কামনা নিয়ে স্নান ক'রবে, তা পূর্ণ হবে। সিদ্ধ বাবাজীর কথা বিফল হবার নয়। এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। ফলে হাজার হাজার স্নানার্থীর ঘৃতদান যজ্ঞে সারা পুষ্করিণীময় ঘৃতের পুরু আস্তরণ প'ড়ে যায়। স্বভাবতঃ নবাবের অনুচরেরা এতে সন্দেহের কোন অবকাশ পায়নি। এভাবে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বোম্বেটেরা জীবনের মত এ পাপবৃত্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ পায়। তদবধি এ বোম্বেটেদের অত্যাচার চিরতরে

অন্তর্হিত হয় ও পুষ্করিণীটি "ঘৃত পুষ্করিণী" নামে প্রচার লাভ করে। আজো শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে পুষ্করিণীটি বিরাজমান।

বাবাজী মহোদয় দীর্ঘ ৩৮ বৎসর সেবা চালাবার পর ১২৭০ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটে। শ্রীনিবাস মহান্ত নামে তাঁর এক শিষ্য নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাটি চালান ১২৯৪ সাল পর্য্যন্ত। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দিবস মাঘী পূর্ণিমাতেই বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। কতিপয় মহাত্মার উপদেশ মত শ্রীনিবাস মহান্ত ১২৮৪ সাল থেকে মহোৎসব অনুষ্ঠানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন তিথি কৃষ্ণা দ্বাদশীতেই ক'রতে থাকেন। তদবধি সেই ভাবেই চ'লে আসছে।

শ্রীনিবাস মহান্তের সেবাকালীন কুঠিঘাটা নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক গৃহস্থ ভক্ত প্রত্যহ পাঠবাড়ীতে যাতায়াত ক'রতেন। ক্রমে মহান্তের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা জন্মে। মহান্তের আপন বলতে কেউ ছিল না। অন্তিমকালে সেবার ভার এই রাজেন্দ্রনাথের উপরই তিনি অর্পণ ক'রে যান। এ ভাবে ১২৯৪ সাল থেকে সেবাটি আবার গৃহস্থের হাতে এসে পড়ে।

রাজেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শশীভূষণের হাতে সেবাটি অর্পণ ক'রে ১৩০২ সালে দেহত্যাগ করেন। শশীভূষণ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই সেবা চালান ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত। তারপর কনিষ্ঠভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ ও পুত্র বিজয় এই সেবাভার প্রাপ্ত হন। ধীরেন্দ্রনাথের দেহান্ত ঘটে ১৩২৮ সালে।

এবার সেবার সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ে এই বিজয়ের উপর। ঠাকুরের আয়ের উপযোগী কোন জমিজমা বা অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। তার উপর বিজয়ের বৃহৎ সংসার। আবার বাৎসরিক মহোৎসবে বেশ কিছু ব্যয়ের দায়িত্ব আছে। তাঁর দ্বারা এ সেবা চালান অসম্ভব হ'য়ে প'ড়ল। কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেবা হস্তান্তরের জন্য তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু কেউ এই আয়বিহীন সেবা গ্রহণে রাজী নয়। পরিশেষে বিজয় শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের কাছে প্রস্তাব ক'রলেন—"আপনি এই সেবার ভার গ্রহণ করে কৃপাকরে আমাকে সেবাপরাধের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

বাবাজী মহারাজ ব'ললেন—"নিতাই চাঁদের কাছে জানাও! তাঁর যদি এরূপ ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তবে হবে।"

এভাবে কয়েক বৎসর কেটে গেল। ১৩৩২ সালের চৈত্রমাসে শ্রীমন্মাপ্রভুর আগমন উৎসব সমাগত। বিজয় প্রমাদ গণলেন। উৎসবের ব্যয়ভার তাঁর দ্বারা চালান অসম্ভব। তিনি স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করেন। বরাহনগরের জমিদার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বনওয়ারী লাল ঢোল, আশুতোষ প্রামাণিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ একটি সভায় মিলিত হন এবং তাঁরা সবাই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্বারা ভিক্ষার আবেদন প্রচারের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এভাবে ১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালের উৎসব পরিচালিত হয়।

১৩৩৪ সালে উৎসবের সময় বিজয় ও উক্ত ভদ্রমহোদয়গণ এই সেবা কোন ত্যাগী বৈষ্ণবের নিকট হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেরকম উপযুক্ত কাকেও না পেয়ে পুনঃ পুনঃ এ প্রস্তাব বাবাজী মহারাজের কাছেই আসতে থাকে।

বাবাজী মহারাজ তখন কলকাতা ও সহরতলীর বিভিন্নস্থানে অবস্থান করতেন। কোন স্থায়ী মঠ তাঁর ছিল না। কলকাতার ভক্তবৃন্দকে এতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত। বাবাজী মহারাজ কখন কোথায় থাকেন, সব সময় তাঁরা সে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন না। এমন কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিল না যেখান থেকে সে সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়। তাই তাঁরা বাবাজী মহারাজের অজ্ঞাতে চেষ্টা করছিলেন কলকাতা বা নিকটস্থ কোন জায়গায় একটি মঠ স্থাপন করবেন। অবশ্য সাময়িকভাবে ১৯০নং দর্ম্মাহাটায় একটি বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল কলকাতায় অবস্থানের কেন্দ্র হিসাবে। মোটামুটি অর্থসংগ্রহের কাজও শেষ হয়েছে—এবার তাঁরা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানের সন্ধানে ঘুরছেন। ক্রমে এ সংবাদ বাবাজী মহারাজের কর্ণগোচর হ'ল। তিনি তাঁদের ডেকে জোরের সঙ্গে ব'লে দিলেন—"শ্রীগুরু-দেবের ইচ্ছা নয় কোন নূতন মঠ স্থাপন করা বরং ঐ সংগৃহীত অর্থে যদি কোন ভগ্নমন্দির বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীর সংস্কার কার্য্য সম্ভব হয় তাই কর!" ভক্তবৃন্দের সব উৎসাহ দমে গেল। তাদের কল্পিত বাসনা হয়ে গেল বানচাল। বাবাজী মহারাজের গাম্ভীর্য্যের কাছে কারও সাধ্য নাই একটি কথা বলে। সকলে ক্ষুণ্ণ মনে নীরব হ'লেন।

এদিকে বিজয়ের পুনঃ পুনঃ করুণ আবেদন বাবাজী মহারাজের অন্তঃস্তলে অনুগ্রহের রূপ নিচ্চে। কোনস্যূত্রে বিজয় জানতে পারে বাবাজী মহারাজের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগের কথা ও তাঁর নির্দ্দেশ। তখন এ সেবাটি বাবাজী মহারাজের নামে হস্তান্তরের চেষ্টা তিনি করতে থাকেন জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ও স্থানীয় অন্যান্য ভদ্রলোকের সহযোগিতায়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এ প্রস্তাব শ্রবণে পরম উল্লাস প্রকাশ করেন ও যাতে সেবাটি বাবাজী মহারাজ গ্রহণ করেন সেজন্য চেষ্টা তিনি ক'রতে থাকেন। অবশেষে বাবাজী মহারাজ এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র গোস্বামী প্রভুর একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টায়ই এ সেবা বাবাজী মহারাজের নামে রেজিষ্ট্রী করা সম্ভব হয়েছিল ১৩৩৪ সালের ৪ঠা চৈত্র বেলা ১১৷৷টায়। এ বিষয়ে বাবাজী মহারাজের ভক্তবৃন্দের মধ্যে যিনি প্রকৃতই প্রাণের দরদভরা আকুতি নিয়ে পরিশ্রম করেছেন তিনি হচ্ছেন কলকাতার তালতলা নিবাসী শ্রীপুলিন বিহারী দে।

৬ই চৈত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন তিথি। ৪ঠা চৈত্র স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের সহযোগিতায় মহোৎসবের শুভারম্ভ হয় শ্রীল বাবাজী মহারাজ ও তাঁর অগণিত শিষ্যবৃন্দের উপস্থিতিতে। এবার যেন উৎসবের মধ্যে একটা নূতন চেতনার সাড়া জেগেছে। অষ্টপ্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ দ্বারা সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরহরির আবাহন জানান হল।

দ্বাদশীর প্রাতে ১০টায় বাবাজী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর

আগমন লীলাকীর্ত্তন ক'রে সকলের প্রাণে এই মহা আগমন তিথিপূজার বৈশিষ্টটিকে জাগিয়ে তুললেন। 'ত্রিকালসত্য গৌর-লীলায় এ তিথিতে তিনি নিশ্চয় এসেছেন! শ্রীগুরু কৃপায় যার প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে তিনি দেখেছেন', ইত্যাদি আখরের দ্বারা কীর্ত্তনের নিপুণ তুলিকায় প্রভুর আগমন চিত্রটি জনহৃদয়ে এঁকে দিচ্ছেন।

ত্রয়োদশীর প্রাতে বিরাট জনসংঘট্ট ভেদ করে সংকীর্ত্তন-কেশরী শ্রীল বাবাজী মহারাজ নগর সংকীর্ত্তন পরিক্রমায় বাহির হলেন। পথ, ঘাট, মাঠ ও বাজারের মধ্য দিয়ে সংকীর্ত্তনের স্রোত চলেছে। বাবাজী মহারাজ এক এক জায়গায় থামছেন ও কিছুক্ষণ ক'রে গৌরসুন্দরের রূপ, রস ও গুণসূচক কীর্ত্তনের তরঙ্গে পথচারীর গতিপথকে রুদ্ধ করে শ্রুতিপথে গৌরসুন্দরের কথামৃত বর্ষণ করছেন, নয়নপথে গৌর রূপের লাবণ্যচ্ছটাকে দিচ্ছেন কজ্জলের মত পরিয়ে। গৌররূপের স্নিগ্ধ অঙ্গচ্ছটায় তাদের আপনা থেকে চোখ বুজে আসছে আর চোখের কোল বেয়ে অজ্ঞাতে ঝরে পড়ছে মুক্তার মত অশ্রুধারা।

উৎসব সমাপ্ত হলে শিষ্যবৃন্দকে আহ্বান করে বাবাজী মহা-রাজ ব'ললেন—যাঁরা এ সেবা কৃপা করে তোমাদের অর্পণ ক'রলেন তাঁদের সম্বন্ধে কি তোমাদের চিন্তা করবার কিছুই নাই? ধীরেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আছেন। তাঁদের এমন কিছু নাই যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে। আমার ইচ্ছা তাঁদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হ'ক।

এ প্রস্তাবের ফলে তাঁদের সাড়ে তিন সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর

কাগজ কিনে দেওয়া হ'লো, আর ধীরেন্দ্রের বিধবা ভগ্নী ও পুত্রের জন্য বারশ' টাকা দিয়ে বনহুগলীতে জমি কিনে বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হ'লো।

এদিকে মহাপ্রভুর মন্দির ও তৎসংলগ্ন যাবতীয় ঘর সবই জীর্ণ। সবগুলিরই সংস্কার প্রয়োজন। মহাপ্রভুর এ মন্দিরটি ইতিপূর্ব্বে সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহোদয়ের ইঙ্গিতে রায়বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১০ সালে সংস্কার করে দেন। তখন এই সেবাটি তাঁর নামে হস্তান্তরের কথা উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা হয়ে উঠেনি। মহাপ্রভুর মন্দির ও ভাগবতাচার্য্যের পাঠঘর এই দুটি পাকা গাঁথুনীর ছিল। বাকী ঘরগুলো ছিল খড়োচালের—এতই জীর্ণ যে কোনরকমে বাঁশের চাড়া দিয়ে দাঁড় করানো।

ভক্তবৃন্দ এগুলিকে সংস্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমে ১৩৩৬ সালের ৩রা আষাঢ় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের মন্দিরের নূতন করে ভিৎ পত্তন করা হয়। একই সময়ে বাবাজী মহারাজের বাসোপযোগী একটি পাকা ঘরও তৈরী হতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সেবাগুলি একটি ভগ্নগৃহে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। ইত্যবসরে বাবাজী মহারাজের গৃহটির নির্ম্মাণ কাজ শেষ হয়ে যায়। একদিন বাবাজী মহারাজ পাঠবাড়ীতে উপস্থিত হলে ভক্তবৃন্দ তাঁকে নূতন ঘরে বাস ক'রবার অনুরোধ জানায়। প্রত্যুত্তরে বৈষ্ণব পুরুষ রুষ্টভাবে বলেন—"ঠাকুর রইলেন ভগ্নগৃহে আর আমি কি না নূতন গৃহে বাস ক'রব। তা হবে না। বরং যতদিন না

মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মাণের কাজ শেষ হ'চ্ছে ততদিন তাঁরা এই নূতন ঘরেই অবস্থান করুন। মহাপ্রভু নিজ মন্দিরে শুভাগমন ক'রলে তবে আমি ঐ ঘরে গিয়ে প্রবেশ ক'রব।" যতদিন না মহাপ্রভু নিজ মন্দিরে শুভবিজয় করেন ততদিন বাবাজী মহারাজ এক ভাঙ্গা ঘরে বাস করেন।

শিষ্যবৃন্দ কোন উপায়ান্তর না খুঁজে পেয়ে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুততর চালাতে থাকলেন। ফলে ১৩৩৭ সালের ৫ই কার্ত্তিক বুধবার প্রতিপদ তিথিতে শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ও বেলা দশটা চল্লিশ মিনিট সময়ে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ নবমন্দিরে শুভবিজয় করেন। পূজা পাঠ কীর্ত্তন ইত্যাদি নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে পবিত্র উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে মার্ব্বেল-পাথরের নাটমন্দির, ভাগবতাচার্য্যের পাঠ ঘর ইত্যাদির নির্ম্মাণ কার্য্য চ'লতে থাকে ভক্তবৃন্দের সাহায্যে ও সহানু-ভূতিতে।

মহাপুরুষদের চরিত্র এতই দুরধিগম্য যে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে তাঁদের নাগাল পাওয়া শক্ত। আমরা স্বভাবতঃ মনে করতে পারি, যে জীর্ণ পাঠবাড়ী আজ পাকা ঘর দালান ও মন্দিরে শ্রীমণ্ডিত হয়েছে তার জন্য বোধ হয় বাবাজী মহারাজ দুয়ারে দুয়ারে চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়েছেন বা লোকের অনুগ্রহকে রাত্রি দিন ধ্যান জ্ঞান করে তিনি কাটিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ যিনি পেয়েছেন তিনিই জানেন কারুর কাছে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুগ্রহভিক্ষার্থী তিনি

কোনদিনই ছিলেন না। বরং যাদের স্বপ্রণোদিত দানের আনুকূল্যে গ'ড়ে উঠেছে এই পাঠবাড়ী, পাছে তাদের মনে অভিমান এসে পতনের মুখে টেনে নিয়ে যায় তাই সাবধান ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন—'এ আনুকূল্য দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করা হ'য়েছে বা চিন্তামুক্ত করা হ'য়েছে এ ধারণা যেন মনে ঠাঁই না পায়। কারণ আমি এ জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি না। বুঝি, সবই তাঁর ইচ্ছা। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা ক'রে তাঁর দান গ্রহণ ক'রেছেন ইহাই মননের রীতি। তাই তিনি সর্ব্বদা স্মরণ মননেই ব্যাপৃত থাক্‌তেন আর সবাইকে বলতেন—ঠাকুরের ইচ্ছে হয়েছে এ কাঙ্গালকে সামনে দাঁড় করিয়ে একটু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকতে। থাক! তোমার ব্যাপার তুমিই জান। কখনও কারো কাছে খাও শাক অন্ন আবার কারও ঘরে ভোগ কর ষড়-ব্যঞ্জন। তোমার যা ইচ্ছা তাই হ'ক।"

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ীর সেবাধিকার শ্রীল বাবাজী মহারাজ গ্রহণ করার পর গভীর রাত্রে নূপুর পায়ে নৃত্যের শব্দ, খড়ম পায়ে অলৌকিক গতায়াত ইত্যাদি নানারূপ অঘটন ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। যুগল বিগ্রহের জন্য মাপের চেয়ে বড় ক'রে সোনার বালা তৈয়ার করান হয় যাতে ভেলভেটের জামার উপরও পরানো যায়। কিছুদিন বাদে দেখা গেল, জামার উপর ত দূরের কথা এমনিতেই তা অনেক ছোট হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে এক শালগ্রাম শিলার আগমন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরের সেবক একদিন হঠাৎ দেখতে পান নারায়ণের সিংহাসনের নীচে এক মূর্ত্তি শিলা। শালগ্রামের উপরে নীচে চন্দন মিশ্রিত কাঁচা

তুলসী ও গলায় রূপার পৈতা। এভাবে বহুতর বস্তুর সমাবেশ অলৌকিক ভাবে হতে থাকে। সে সব তথ্যের সন্নিবেশ ক'রে লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

একবার কতুলপুর নিবাসী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র কাব্যতীর্থ নামে এক পণ্ডিত কার্য্যের অনুসন্ধানে কলকাতায় এসে বাবাজী মহারাজের আশ্রয়প্রার্থী হন। বাবাজী মহারাজ তাঁকে একদিন ব'ললেন—"আপনি যদি কোন কাজের সুবিধা ক'রতে না পারেন তবে পাঠবাড়ীতেই একটি টোল স্থাপন করুন ও মঠের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিন। আহারাদির ব্যবস্থা মঠ থেকেই হবে। তিনি এ প্রস্তাব প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করেন ও অদ্যাবধি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এ কার্য্যে লিপ্ত আছেন। কিছুদিনের মধ্যেই বহু ছাত্র কাব্য ব্যাকরণ ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে উপাধি পেতে থাকেন। টোলের নামকরণ হয় "শ্রীভাগবতাচার্য্যের টোল।" এরূপে বাবাজী মহারাজ বিদ্যার্থীদের সুযোগ সুবিধার জন্যও বহুভাবে চেষ্টা করেন। তিনি বিদ্যার্থীদের সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। বিদ্যার্থীদের উৎসাহ দান তাঁর একটি সহজাত বৃত্তি। অবশ্য লক্ষ্য ছিল যে, তারা যেন ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হয়—কারণ, ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ভূমি প্রস্তুত না হ'লে প্রেমভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের প্রতিষ্ঠা পাঠবাড়ীর ইতিহাসে আর একটি স্বর্ণযুগ রচনা করে দেয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সতীর্থ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্য-সরস্বতী মহোদয় বহুদিন যাবত অক্লান্ত পরিশ্রমে দুষ্প্রাপ্য বহুতর গ্রন্থ, পুঁথি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালের স্মৃতি বিজড়িত নানা উপকরণ সংগ্রহে ব্রতী ছিলেন। এই অমূল্য দ্রব্যসম্ভার রায়ভট্ট মহাশয়ের নিজস্ব বাসভবনেই রক্ষিত হ'ত। সংগ্রহের পরিমাণ দিনে দিনে স্ফীততর হ'তে থাকে। ভট্ট মহাশয় সর্ব্বক্ষণ নিজস্ব তত্ত্বাবধানেই এই সব দ্রব্যসম্ভারের যথোপযুক্ত যত্ন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেন। দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে এগুলিকে ঠিকভাবে রক্ষা করা কত ব্যয় ও যত্ন সাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। তাই তিনি তাঁর প্রাণের রামদাদার কাছে এগুলিকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণা ও স্থায়ীভাবে রাখার জন্য প্রায়ই প্রস্তাব করতেন।

এ আবেদনের ফলে বাবাজী মহারাজের দৃষ্টিকোন থেকে একটা অব্যক্ত আগ্রহের সমবেদনা ফুটে উঠত। সবইতো সময় সুযোগ ও পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে এক একটি রূপ নেয়! পাঠ-বাড়ীর শ্রীবৃদ্ধির পথে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে ভিত্তি করে এই গ্রন্থমন্দিরের সূত্রপাত হয়। সে কাহিনীই এবার এখানে বিবৃত করছি।

১৩৩৯ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় পাঠ-বাড়ীতে আকস্মিকভাবে এসে পড়ে ৫টি বিরাট বাক্সে ভর্ত্তি প্রায় দেড় সহস্র সংখ্যক বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি। এগুলির প্রেরক মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের বাবাজী মহারাজের একান্ত গুণমুগ্ধ শ্রীগোপেশ্বর মৈত্র মহোদয়। তিনি সারা জীবনব্যাপী সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসম্ভার তাঁর করকমলে সমর্পণ ক'রেছেন। এ

দৃশ্যে বাবাজী মহারাজের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি এগুলির জন্য শ্রীশ্রীবিগ্রহের অনুরূপভাবে পূজা আরতি ভোগ ইত্যাদি সেবানুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু এ বিরাট সম্পদ কোথায় রাখা হবে তাই এক সমস্যা। অবশেষে বাবাজী মহারাজের কক্ষেই সাময়িক ভাবে রাখা হ'লো।

ভক্তমহলে গ্রন্থ আগমনের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করে। প্রতিদিন দর্শক ও ভক্তবৃন্দের আগমনে পাঠবাড়ীর প্রাঙ্গণ ভ'রে উঠে। কক্ষের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে এই গ্রন্থগুলির অবস্থান, তার উপর বাবাজী মহারাজ প্রায়ই কবাট বন্ধ ক'রে সর্ব্বদা তাঁর ভজনে ব্যাপৃত থাকেন। শুধু অবসর সময়ে মাঝে মাঝে দরজা খোলেন। এতে ভক্তবৃন্দের বিশেষ অসুবিধা হ'তে থাকে এবং বাবাজী মহারাজের অসুবিধার দিকটাও তাঁদের চক্ষ্যে পড়ে। এবার ভক্তবৃন্দের উদ্যোগ চ'লতে থাকে এই গ্রন্থগুলি রক্ষার জন্য পৃথকভাবে একটি স্থায়ী সংরক্ষণাগার নির্ম্মাণের।

এ উদ্যোগপর্ব্বে প্রথম অগ্রণী হ'য়ে আসেন উড়িষ্যাবাসী মধ্যবিত্ত পরিবারের এক ভক্ত—নাম শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দাস। উক্ত পরিকল্পনার সংবাদ শ্রবণ মাত্রই দুই সহস্র টাকার একটি কোম্পানীর কাগজ বাবাজী মহারাজের চরণে তিনি ভিক্ষার্পণ করেন। এই সূত্রে আরও কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ হয়। পরে ১৩৪০ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা সাড়ে নয় ঘটিকায় বাবাজী মহারাজ ও অন্যান্য বহু ভক্তের উপস্থিতিতে প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী রূপার একটি কর্ণিকা হস্তে গ্রন্থমন্দিরের ভিত্তি পত্তন করেন।

পুণ্যবতী মহীয়সী নারী শ্রীসখিসোনা দাসী (পোস্তার রাণী) তাঁর স্বামী ৺কুমার হরিপ্রসাদ রায়ের স্মৃতিকল্পে প্রায় বিশ সহস্র টাকা ব্যয়ে এক গ্রন্থমন্দির নির্ম্মাণ করে দেন।

১৩৪১ সালের ২৫শে মাঘ শুক্রবার শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিন বাবাজী মহারাজের গৃহে রক্ষিত গ্রন্থগুলি নূতন মন্দিরে আনয়ন করা হয়। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনোৎসব ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সপ্তাহ ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থের পারায়ণ ক'রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও শ্রীবৈষ্ণব প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হ'ল।

শ্রীশ্রীগ্রন্থমন্দিরে সংগ্রহের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ক বিশদ বিবরণ এখানে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। হস্তলিখিত পুঁথি, স্তব, স্তোত্র, কবচ, দলিল ও পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভাস্কর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের বিরাট প্রদর্শনী দেখলে স্বভাবতই বিস্মিত হ'তে হয়। মহাপ্রভুর স্মৃতিমণ্ডিত প্রদর্শনী গ'ড়ে ওঠার মূলে যে মহানবৈষ্ণবের নীরব ও নিষ্কাম কর্ম্মানুপ্রেরণার ছন্দ রূপায়িত হয়ে উঠেছে এইভাবে তা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে যুগ যুগ ধ'রে।

এ মন্দিরে রয়েছে, খ্যাত অখ্যাত বহু ভক্তের স্মৃতি উদ্দীপক চিত্রাবলী, তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পত্রাবলী প্রভৃতি অসংখ্য বস্তুর অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ। লক্ষ বৈষ্ণবের চরণরজ, সমস্ত তীর্থের বারি ও রজ প্রভৃতির এমন সংগ্রহ আর কোথাও আছে ব'লে আমাদের জানা নাই।

বর্ত্তমানে গ্রন্থমন্দিরটির সংস্কার হ'য়েছে ও নূতন ভাবে নির্ম্মিত

দ্বিতলে মূল্যবান সংগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে। কারণ একতলার ঘরে ড্যাম্প হওয়ায় ও ছাদ ফেটে যাওয়ায় বিশেষ অসুবিধা ভোগ ক'রতে হত।

ইহাই বাবাজী মহারাজের পাঠবাড়ীর মোটামুটি ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান যুগের নামগানের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা, শ্রেষ্ঠ চারণ ছিলেন এই রামদাস বাবাজীমহারাজ। সহস্র সহস্র মানুষকে তিনি ধন্য করেছেন তাঁর কৃপায়, টেনে এনেছেন তাঁর স্নেহচ্ছায়ায়— অভিসিঞ্চিত হয়েছে অসংখ্য ভক্ত নরনারী তাঁর নামরসের বর্ষণে।

পরিণত বয়সের এই ভাবময় সাধককেই আমরা দেখেছি নামগানে উন্মত্ত অধীর। এ মহাপুরুষকে দেখে আধুনিক মানুষের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। প্রভু জগদ্বন্ধু আর চরণদাস বাবাজীর হাতে গড়া মহাসাধক ইনি। কি এর স্বরূপ ? পূর্ব্বাশ্রমে কে ছিলেন এই মহাবৈষ্ণব সাধক ? কোথায় তাঁর জন্ম ? কোন্ প্রবাহের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে এসেছে তাঁর জীবন ? এ সব তথ্য জানবার আগ্রহ লোকের কম নয়। কিন্তু এ আগ্রহ মেটাতে পারে এমন কেউ সত্যিই আছে কি ? ভাব-গম্ভীর জীবনের মূলে, অন্তরের অন্তস্তলে যে গোপনচারী সাধনার ধারা বয়ে চলেছে, তার সংবাদ কে দেবে ? কি করেই বা দেবে ? সে যে লোকোত্তর মহাপুরুষের অলৌকিক ভাব-সম্পদময় মণিকোঠা! সেখানে প্রবেশ করার সামর্থ্য কার ?

কিন্তু অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন তবু থেকেই যায়, অতৃপ্তি বেড়েই চলে। উপায়ান্তর অভাবে তাই এ মহাপুরুষের বহিরঙ্গ জীবনের

কথা নিয়ে, স্থূল জীবনের মোটামুটি তথ্যাদি নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এ পরিশিষ্টে আমরা রামদাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে দু'চারটি কথা বলবো—যাঁরা তাঁর জীবন তথ্য সম্বন্ধে মোটেই কিছু জানেন না, তাঁদের পক্ষে কিছুটা সুবিধে হবে।

ফরিদপুর সহরের প্রায় বার ক্রোশ দূরে, পদ্মার তীরে কোঙরপুর গ্রাম। এই ক্ষুদ্র গ্রামটি হচ্ছে মাদারীপুর মহকুমা ও পালং থানার অন্তর্ভুক্ত। এই অখ্যাত অবজ্ঞাত স্থানে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ২২শে চৈত্র তারিখে, মধ্যরাত্রে আবির্ভূত হন, বহুবিশ্রুত মহাবৈষ্ণব রামদাসজী। পিতা দুর্গাচরণ ও মাতা সত্যভামার ইনি অষ্টম সন্তান। আদর করে এই শিশুর নাম রাখা হয় 'রাধিকারঞ্জন'। সকলে আদর করে ডাকতো রাধিকা।

গুপ্ত পরিবার অতঃপর ফরিদপুর সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সুরু করে। বালক রাধিকার পড়াশুনা চল্‌তে থাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে।

তাঁর জীবনলীলার কথা আলোচনা ক'রলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি এমন কতকগুলি সহজাত বৃত্তি নিয়ে জগতে এসেছিলেন যা কেবলমাত্র মহামানবেই সম্ভব। বাল্যেই তাঁর চলন-বলন থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর মধ্যে ভাবী জীবনের মহা-সম্ভাবনার নিদর্শন দেখা গিয়েছিল।

রাধিকা এমন শ্রুতিধর ছিলেন যে, যখন যা শুনতেন তার ভাব ভাষা তাঁর হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যেত। যাত্রা শোনার বড় ঝোঁক ছিল। যদি শুনতেন, কোন জায়গায় যাত্রা বা কীর্ত্তন গান হবে ত'

আর রক্ষে নেই। রাধিকাকে যেতেই হবে ধাইমায়ের কোলে চেপে। বাড়ীতে ফিরে এসে সেই গানগুলি অবিকল গাইতেন। এতে তাঁর জ্যাঠামশাই একদিন খুব উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন —হ্যাঁরে রাধিকা! তুই যে একেবারে ফটো তুলে এনেছিস।

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায়ও রাধিকা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতেন। তার উদাস নয়ন দুটি ছিল বিশ্বজনের বেদনায় ভরা, কারও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব খুব ঘটা করে হ'ত। তাতে রাধিকা খুব মেতে উঠতেন আনন্দভরে। একবার দুর্গা পূজায় পাঁঠা বলির দৃশ্য তাঁর সহ্য হলো না, হৃদয় ভরে উঠল বেদনায়, হলেন মূর্চ্ছিত। তদবধি মায়ের পূজায় তাঁদের বাড়িতে বলি উঠে যায়।

রাধিকার দেহটি দৃঢ়, হৃদয়েও ছিল অসীম সাহস। ১২৯১ সালে আশ্বিন মাসে পূর্ব্ববঙ্গে একটি প্রবল ঝড় বয়ে যায়। বিশেষ করে ফরিদপুরে ঝড়ের প্রকোপটি প্রবল ভাবে দেখা দেয়। এই ঝড়ে রাধিকার জ্যাঠামশায় তাঁদের বাড়ীর একটা চালাঘরে চাপা পড়েন। সকলেই হায় হায় করছে, এমন সময় দেখা গেল, বালক রাধিকা অমিত বিক্রমে সেই ভগ্নস্তূপ থেকে বৃদ্ধের জীবন রক্ষা করেন। বালকের সাহস দেখে তো সবাই বিস্মিত!

রাধিকার কণ্ঠের সুরমাধুর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করত। রাধিকার এক দাদা দেশাত্মবোধক একটি নাটক লেখেন। সবাই মিলে এই অভিনয়ের মহরৎ দিচ্ছে। নাটকের রচয়িতাই এই অভিনয়ের পাণ্ডা, পাণ্ডাকে সকলেই ধরে বসল তাঁর ভাই রাধিকাকে ভারত-জননীর পার্ট দেবার জন্য।

রাধিকা ইতিপূর্ব্বে কখনও অভিনয় করেন নি। নাটকের শ্রেষ্ঠাংশ ভারতজননীর পার্টে অনেকগুলি গান আছে। উপযুক্ত অভিনেতার অভাবে থিয়েটার বন্ধ হয়, সেজন্য অভিভাবকেরা রাধিকাকে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন।

বহু দর্শনার্থীর সমাগমে রাধিকা উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন—

আজিরে ভারতমাতা হয়েছে বন্দিনী,
প্রেম মোক্ষ দয়া মায়া শূন্য হল এ ধরণী।
(একদিন) ভ্রমিতেন রে দিবানিশি
কত মুনি কত ঋষি,
(সেই মাতা) হয়েছে আজ কাঙ্গালিনী।
পরাণে আর না সয় দুঃখ
না দেখিয়া চাঁদ মুখ,
কে চাহিবে মার মুখ
আর সরেনা সরেনা বাণী॥

সকলেই রাধিকার গান ও অভিনয় চাতুর্য্যে প্রশংসামুখর। এই থিয়েটারে দর্শনার্থী হিসাবে ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। বালকের অমৃতবাহী সুরচ্ছন্দে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও তিনি এর আগে একদিন স্থানীয় স্কুলবাড়ীর প্রাঙ্গনে রাধিকার সাহচর্য্য পান এবং তার সপ্রণয় ব্যবহারে মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁর কাছে অবজ্ঞাত ছিল রাধিকার এ মধুর কণ্ঠস্বর।

'বন্ধুর' সঙ্গে রাধিকার ঘোরাফেরা বেশ জমে উঠল। এদিকে বাড়ীতে কড়া শাসনের ব্যবস্থা হল যাতে বন্ধুর সঙ্গে ঘোরাফেরা

বন্ধ হয়। কিন্তু যাঁকে জগতের বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন তাঁকে সংসারের বেড়াজালে কি আটকে রাখতে পারে? সবকিছু কৌশল বানচাল হয়ে গেল রাধিকার প্রবল বৈরাগ্যের তোড়ে।

একদিন বন্ধুরই সাহচর্য্যে ১৭ বৎসরের যুবক বেরিয়ে পড়ল নিঃসঙ্গ অবস্থায় বৃন্দাবনের পথে কাঙাল বেশে। এখানে তিনি নিয়মনিষ্ঠার নিগড়ে বাঁধা পড়লেন চরমভাবে। সে কঠোরতার কথা শুনলে বিস্মিত হতে হয়। রাত্রি ৩টার সময় শয্যাত্যাগ করে প্রাত:কৃত্য সমাপনান্তে যমুনায় স্নান ও পরে এক গেলাস শিউলি পাতার রস পান করে সাধনার আসনে উপবেশন। শয্যার মধ্যে একটি চাটাই আর উপাধান মাত্র একটুকরা কাঠ। মিষ্টদ্রব্য অথবা পক্কান্ন খাওয়া একেবারে ছিল নিষিদ্ধ। কারণ, উহা ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে হানিকর।

এবার কিশোর রামদাস বৃন্দাবনে থেকে লীলানুধ্যানে এমন মেতে গেলেন যে বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার স্বপ্নও তাঁর কাছে বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। চব্বিশ প্রহর ভজনানন্দে ডুবে থাকতেন। এমতাবস্থায় বন্ধু একদিন বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা বলায় রামদাস অসম্মত ভাব দেখান ও ব্রজে ভজনানন্দে থাকবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রার্থনা করেন।

তাতে বন্ধু বলেন—"আপন আপন খাবার যোগাড় ত পশু পাখীরাও ক'রে থাকে। দশজনকে খাইয়ে যে খায় সেই ত প্রকৃত মানুষ", এ কথাগুলি তাঁর অভীষ্টদেবের বাণীরূপেই প্রাণে বেজে উঠল। ব্রজে ভজনানন্দে থাকবার আবেশ ঘুচে গেল।

প্রাণ কেঁদে উঠল কি করে পরামাস্বাদনীয় রসবস্তু জীবকে বিলানো যায় এই চিন্তায়।

এই সময় কলিকাতায় এলেন। কিন্তু থাকবেন কোথায়? স্থান হ'ল যারা সমাজের চিরঅবহেলিত তাদের মরমী সঙ্গী রূপে। তারপর সাক্ষাৎ হল নামগুরুরূপে ভৈরবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে। সিদ্ধ চরণদাস বাবাজী মহাশয় তখন আপামর জনসাধারণকে প্রেমের অফুরন্তবীর্য্যে মাতিয়ে তুলেছেন শ্রীনিতাই-গৌর গুণগ্রামে।

রামদাস তাঁর কৃপাস্রোতে সাঁতার দিলেন। বন্ধুর—"খাইয়ে খাওয়ান" বাণীই জীবন্তরূপে ধরা দিল রামদাসের কাছে—শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী রূপ ধরে। ক্রমে তিনি নামপ্রেম বিতরণের কার্য্যে চরণদাসবাবাজী মহারাজের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন।

সুরু হ'ল তার বিস্ময়কর জীবন। প্রথম সাক্ষাতেই চরণদাস বাবাজী কিশোর রামদাসের কণ্ঠের সুর মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন এবং আশীর্ব্বাদ করেন যে, নিতাইচাঁদ তাঁর দ্বারা জগতের অনেক উপকার ক'রবেন। এদিকে বন্ধুসুন্দর প্রাণপ্রিয় রামকে বিদায় দিয়ে বিরহবেদনা দাহ নীরবে সহ্য করছেন। সে সময়ে শ্রীজগদ্বন্ধু রামদাসকে একটি পত্র লিখ্‌লেন—

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
কেমনে কহিবরে কেমনে সহিবরে।
স্মরিতে দারুণ কথা শরীর শিহরে।
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
কেমনে লিখিবরে কেমনে দেখিবরে।
সাধিতে স্বীকার হায় হৃদয় বিদরে।
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
কেমনে রহিবরে কেমনে কহিবরে।
স্মৃতিশেল নিদারুণ রহিবে অন্তরে।
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
কেমনে তুলিবরে কেমনে ভুলিবরে।
সুখময় সঙ্গ আর কারে দিব ধরে।
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
যতনে পোষিত স্মৃতি ডুবাব কেমনে।
যদিও মিলেছে সাধ নৈরাশ্য অম্বরে।
কি বলে বুঝাব করে মৃদঙ্গ দর্শনে।
কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
যার আগে আজ্ঞাকারী ছিলনারে কেহ।

রহিত নির্ভর মোর সদা য়ার করে।
(তারে) কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে ॥

কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে।
সাত্ত্বিক ভূষিত বপু থাকিত যে সদা।
বন্ধুনাম অম্বরে যে তুলিত সুস্বরে।
অন্য লক্ষ্য সঙ্গ যার নাহি ছিল কদা।
(তারে) কেমনে বিদায় দিব চিরদিন তরে ॥

সঙ্গ অগ্রে পরে শোভে ব্রজবাস।
কাতরে বিনয় করে জগদ্বন্ধু দাস ॥

বন্ধুর এই বিরহ কবিতাতে বোঝা যাচ্ছে যে রামদাসের বিদায়-ব্যথা তার মর্ম্মকেন্দ্রকে কতখানি আলোড়িত করেছিল। এতদিন রামদাসের হৃদয়ের যে প্রেমনদীটি মন্দ মন্দ গতিতে চলছিল তাতে এল উত্তাল তরঙ্গমালা। তরঙ্গের আঘাত জীবননদীর দুকূলে আছড়ে পড়তে থাকলো।

এবার চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশ-বিদেশে নাম-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পর্য্যটন সুরু হ'ল। এ যেন চন্দ্র ও তার কিরণ। চরণদাসজীর পাশে পাশে তিনি ফিরতে থাকলেন। যেখানেই উপস্থিত হন সেখানকার লোক এঁদের গতি প্রকৃতি ও নাম-কীর্ত্তনের আত্মভোলা আনন্দস্রোতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যায়। তারা দেখে এঁদের গুরু শিষ্যের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ! গুরু শিষ্যে ভাই

ও দাদা সম্বোধনের অতি নিকট অন্তরঙ্গতা। শিষ্যেরা দাদা ছাড়া জগতের সুখ দুঃখ কোন কিছুই জানে না বা বোঝে না।

পদব্রজে গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেন কীর্ত্তনস্রোতের তালে তালে। দাদার নির্দ্দেশ ভিন্ন সে গতিবেগ রুদ্ধ হয় না। আহারের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। দাদার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কীর্ত্তনসহ অযাচক ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত দ্রব্যে হয় ঠাকুরের ভোগ। আর আগন্তুক অতিথিবর্গের সেবা ক'রে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি। ভিক্ষার্জ্জিত অতিরিক্ত দ্রব্য একবেলার জন্য বা পরদিবসের জন্য সংগৃহীত থাকবে না। পরিধানে একটুকরা কাপড় ও ভজনাঙ্গীয় সামান্য কিছু। ইষ্টদেবের চিত্রপট, করতালি, গ্রন্থ ইত্যাদি ব্যতীত অতিরিক্ত কোন দ্রব্য রাখবার উপায় ছিল না। এভাবের জীবন-যাত্রায় রামদাসজী অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। চরণদাসজী অতি প্রীত হ'লেন।

একে কিশোর রামদাসের ত্যাগপূত সাত্ত্বিক বপু, তায় কণ্ঠে ভরা প্রেম-মধুর কণ্ঠস্বর। এদিকে গুরু শিষ্যের উপর নানা আদেশ দিচ্ছেন। বৈরাগ্যের কষ্টিপাথরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় পুরাপুরি তা ঝালিয়ে নিচ্ছেন। দেখলেন, একেবারে নিখাদ।

চরণদাসজীর মনে আনন্দের অবধি রইল না। এরপর গুরু-শিষ্য উভয়ে উপনীত হ'লেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। গুরু আনুগত্যেই বহু সিদ্ধমহাত্মার সঙ্গলাভ ঘটল। রামদাস যেখানেই যান অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁদের প্রিয়জন হ'য়ে উঠেন। অন্তরঙ্গ রসরঙ্গের অতি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিলাসটী তাঁদের উপভোগ করাতেন তাঁর

সুধাকণ্ঠের কীর্ত্তন উপচারে। তারা রস-আস্বাদনে উন্মাদ হ'য়ে উঠতেন। তাই ক্ষণে ক্ষণে আদেশ আসত—ভাই রাম! একটী কীর্ত্তন ধরত! রামও আদেশের সাথে সাথে তাঁদের অন্তরের চাহিদার খবর পেয়ে যেতেন। অমনি কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত ভাব-অনুকূল সুর-লহরী। নিভৃত গোফায় চ'লত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রহরের পর প্রহর সে রসাস্বাদন। ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু, কম্প, স্বেদ ও পুলকের শিহরণ তাঁদের অঙ্গে খেলে যেত। কখনও বা মুহুর্মুহু ফুটে উঠত হাস্য ও আনন্দের ধ্বনি। দিনগুলি এমনিভাবে এগিয়ে চ'লতে থাকে।

চরণদাসজী এবার প্রিয় রামদাসকে নিয়ে ফিরলেন কলিকাতা। এমন একজন ভক্ত রসদাতাকে সিদ্ধ মহাত্মাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, এ কথা তাঁরা কোনদিনও চিন্তা করেননি। রামদাসও সে রসাস্বাদনের লোভ থেকে নিজেকে সংযত ক'রতে না পারলেও একথা জানা ছিল যে, তাঁর সাধনক্ষেত্র এটা নয়। পতিত-পাষণ্ডের মধ্যে থেকে তাদের প্রেমাবতারের বাণী শুনানোই তাঁর কাজ। শুধু কি তাই? তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে মহাপ্রভুর আদর্শ। তাই কলকাতায় পতিত-পাষণ্ডের মাঝে তাদের আপন জন হ'য়ে নিজের আসন পেতে নিলেন। গুরুর আদেশে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে দিনগুলি কাটতে থাকলো।

অল্পদিনের মধ্যে রামদাসজীর নিরভিমান, সপ্রণয় ব্যবহার সকলের চিত্তকে জয় ক'রে ফেলল। আরও বড় আকর্ষণ—সকলের হৃদয় জুড়ে বসল তাঁর নামকীর্ত্তনগান। চরণদাসজীর তাঁর উপর

আদেশ ছিল, ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন ক'রবার জন্য। প্রভাতী-কীর্ত্তন ভোর ৪টায় আরম্ভ ক'রে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত, আবার সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন সন্ধ্যায় আরম্ভ হ'য়ে রাত্র ১০।১১টা পর্য্যন্ত চ'লত। কীর্ত্তনে উদ্‌গত হতো ভাব ও ভাষার মাধুর্য্য আর আখরের বৈভব। তাঁর কীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে কেউ অস্বীকার ক'রতে পারেনি। এই কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে অনেকে চরণদাসজীর আশ্রয় পেয়েছেন।

এ সূত্রেই রায়বাহাদুর প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চরণদাসজীর আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাঁর এঁড়েদার বাগানবাড়ীতে অবস্থান কালে বড়বাবাজী মহারাজ একদিন শুক্লাপক্ষের চাঁদিনী রাত ২টার সময় প্রিয় রামদাসসহ চারজনকে পাঠিয়ে দিলেন গঙ্গাস্নানে। নিয়ম ছিল কীর্ত্তনসহ গঙ্গাস্নানে গমন আবার স্নানান্তে উক্ত ভাবে প্রত্যাগমন। সকলে গঙ্গার ধারে এসে দেখেন, চারিদিকে নিশুতি রাত্রির গভীরতার মাঝে চাঁদিনীর রজতশুভ্র জ্যোছ্‌না-ধারা ধরণীর বুকে ছড়িয়ে প'ড়েছে। পরস্পর বলাবলি ক'রছেন—এ আবার কি নূতন খেলা! চুপচাপ ব'সে আছেন প্রভাতের আগমন কালকে অপেক্ষা ক'রে। অনুভবী রামদাস সকলকে ব'ললেন—নিশ্চয় এর মধ্যে কর্ত্তার কিছু উদ্দেশ্য আছে! ব'সে না থেকে বরং নাম করা যাক! রামদাস কীর্ত্তন ধ'রলেন—

"জয় শচীনন্দন জগজীব তারণ।
কলি কলুষ নাশন অবতার॥"

গঙ্গার কুলু কুলু তানের সাথে রামদাসের মধুকণ্ঠ ভেসে চ'লেছে দূর থেকে দূরান্তরে। ব্যাকুল বাতাসের বুকে যেন সহস্র সহস্র

শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ঠেলাঠেলি ক'রে জড় হ'য়ে শুনছে নামকীর্ত্তনের অন্তরাত্মার বাণী। কেন এই সুপ্তিময় রজনীর বুকে অপরূপ আনন্দের এ মধুময় পরিবেশন ?

প্রভাত উত্তীর্ণ হ'য়ে সূর্য্যের তীব্র রশ্মিজাল ছড়িয়ে প'ড়ল পৃথিবীর বুকে। কীর্ত্তনকারীদের জাগতিক বোধশক্তির কোন বিকাশ যেন নাই। উদ্দাম কীর্ত্তনের বেগ পাগলের মতই এগিয়ে চ'লেছে। এঁড়েদার এই জনবিরল ঘাটে এ মধু আস্বাদনের নিভৃত বিলাসবার্ত্তা কি ক'রে ছড়িয়ে প'ড়ল চার্‌দিকে কে জানে! বেলা বাড়বার সাথে সাথে স্থানটী জনাকীর্ণ হ'য়ে উঠল। বেলা আটটা নাগাদ কীর্ত্তনের সমাপ্তি ঘটল।

স্নানান্তে কীর্ত্তনসহ বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হ'লে চরণদাসজী সকলকে দৃঢ় আলিঙ্গন দান ক'রলেন। ভ্রমবশতঃ অধিক রাত্রে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের যে কষ্ট হ'য়েছে এ কথাও ব'ললেন। তদুত্তরে রামদাসজী সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে জানালেন—আপনার কৃপায় আজ কীর্ত্তনে যে আনন্দ লাভ ক'রেছি তা জীবনে ভুলবার নয়। কীর্ত্তনে যে সব ভাষা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি কোন-দিন শুনিনি বা জানি না। চরণদাসজী উল্লসিত হ'য়ে সব বিবরণ শুন্‌লেন ও মন্তব্য ক'রলেন—"জাহ্নবী দেবীর কৃপায় যা পেয়েছ তা ধ'রে রেখো। অনেকের উপকার হবে। একদিন ভাই আমাকে এ বস্তু শুনাবে ?"

রামদাস—এ যন্ত্র হচ্ছে আপনারই কৃপার দান। আপনি শুনবেন, এতে আমার সম্মতি বা আপত্তির কি আছে।

এরপর অবসর মত চরণদাসজী একদিন "জয় শচীনন্দন"

কীর্ত্তনটী শুনে অপার আনন্দসাগরে ডুবে যান। রামদাসকে তিনি প্রাণভরে বহু আশীর্ব্বাদ করেন।

কীর্ত্তন সাধনার এমন একটি রূপ রামদাসজী এ যুগে তুলে ধরেছিলেন যা অননুকরণীয়। কেবল সুর-সম্পদে বা কণ্ঠের কৌশলে সে রূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করানো যায় না। যেমন বীণাযন্ত্রের এমন একটী তারের এমন একটী বিশেষ স্থিতিকে বাদক সুরে বাঁধে যে একটু এধার ওধার হ'লে সে ঝঙ্কার আর ফুটে ওঠে না। তেমনি সাধনরাজ্যের সিদ্ধির ক্ষেত্রে এমন একটী মাধুর্য্য সুর আছে যেখানে না পৌঁছলে প্রকৃত রসের সন্ধান মেলে না।

কীর্ত্তনের সুরধারার সঙ্গে তাঁর নয়নের দুকোণ বেয়ে যখন ঝরে প'ড়ত পুলকাশ্রুর ধারা তখন কীর্ত্তনের ভাষা জীবন্ত হ'য়ে জাগিয়ে তুলতো মানুষের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আলোড়ন। মনের মূলে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতো অখিলাত্ম দেবতার সংবেদনময় মূর্ত্তি।

শাস্ত্রে আছে, নববিধাভক্তির মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাধনমার্গের কোন্ পর্য্যায়ে পৌঁছলে এ বস্তুটি কিভাবে মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে ছড়িয়ে প'ড়ে তা দেখবার সুযোগ বিংশ শতাব্দীর যুগেও সম্ভব হ'য়েছে বাবাজী মহারাজের অমৃত-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব কবি দেবকী নন্দন দাস এই শ্রেণীর কীর্ত্তনপাগল, নাম-প্রেম উদ্গাতা মহাত্মাদের কথা উল্লেখ করেই বলেছেন,—

(তাঁরা) জগতে দুর্ল্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে।

বরাহনগরে কেদার বাবুর বাগানবাড়ীতে অবস্থান করার কালে চরণদাসজী একদিন রামদাসকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে অশ্রুবর্ষণ ক'রতে লাগলেন। রামদাসেরও নয়নের দুকোণ বেয়ে

অশ্রুপ্লাবন ছুটল। গুরু-শিষ্য কি এক রসে আত্মহারা। একটু সম্বিৎ ফিরে পেতেই রামদাসকে বৈরাগীর বেশে সাজিয়ে এক হাতে একটী তুলসীবৃক্ষের টব অপর হাতে একটী পিচের লাঠি দিয়ে ব'ললেন—তোমার যত পরিচিত ব্যক্তি আছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এস। এভাবে ত াঁর বেশাশ্রয় হ'ল। এর পর কতদিন এই বৈরাগী হয়ে দেশে দেশে দীনহীন কাঙালের বেশে গেয়ে বেড়ালেন শ্রীগৌরাঙ্গ নামগান।

চরণদাসজী অপ্রকট হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে প্রিয় রামদাসের হাতে তুলে দিলেন নিজের করতাল দুটি। ব'ললেন—তোমার জন্য রইল এই করতাল। এই দিয়ে জীবের দ্বারে দ্বারে নাম শুনাবে। এই তোমার কাজ।

রামদাসজী সারাটি জীবন ঐ করতালের মধুসংলাপে কত যে জীবের জীবনমূলে নামামৃত রস দান ক'রে সঞ্জীবিত ক'রে তুললেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি কোন সঙ্ঘ গ'ড়লেন না, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন না। তাই তাঁর অনুগামীরা হলেন শুধু তাঁর নামেই পরিচিত। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার বা লীলাস্থলীর স্মারক মন্দির ভিন্ন কোন নূতন মঠ বা মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করান নি। আরও বড় কথা! চরণদাসজীর কঠোর আদেশ ছিল—নিজেকে বৈষ্ণব মনে না করা। সেজন্য কোন বৈষ্ণব পঙ্গতে (প্রসাদ ভোজন ব্যাপারে) এক পংক্তিকে বসা নিষেধ ছিল। বরং ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার পর পথভিক্ষুকের মত ভুক্তাবশেষ বৈষ্ণব-অধরামৃতজ্ঞানে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর নির্দ্দেশ। সেজন্য বৈষ্ণব সেবার কোন আমন্ত্রণে বাবাজী মহারাজ ও তাঁর অনুগামীগণ যেতেন না। আমন্ত্রণের

মর্য্যাদা রক্ষা করা হ'ত উক্তরূপ অধরামৃত গ্রহণ ক'রে। আর একটী উপদেশ—'আচণ্ডালে কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্ত করি॥' এ নির্দ্দেশগুলি রামদাসজী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক'রে গিয়েছেন।

মহাপুরুষের জীবনকাব্যের অপূর্ব্ব রসধারার যৎসামান্তই এখানে পরিবেশিত হ'ল। বাংলা তথা ভারতের জনচিত্তে আজও বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তন রসধারার বিস্তার, শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ লীলার বৈশিষ্ট্যময় ভাষ্য ও ব্যাখ্যান এক অমর অবদান হিসেবে বেঁচে থাকবে। এ মহাজীবনের স্পর্শ পেয়ে সার্দ্ধ তিন লক্ষাধিক লোক নামমন্ত্রে নিজেদের জীবনের যাত্রাপথ মধুর ক'রে তুলতে পেরেছে। তাঁরা কৃতকৃতার্থ হয়েছেন।